Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১০ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০০৭

মাসিক

আত-তাহরীক

১০তম বর্ষ মে ২০০৭ ইং ৮ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

আবারো বোমা বিস্ফোরণঃ কথিত জাদীদ আল-কায়েদার দায়িত্ব স্বীকার

গত ১লা মে মঙ্গলবার বাংলাদেশ রেলওয়ে ঘোষিত 'সেবা সপ্তাহে'র প্রথম দিন সকাল পৌনে ৭-টা থেকে সোয়া ৭-টার মধ্যে রাজধানী ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশন, চট্টগ্রাম রেলস্টেশন ও সিলেট রেলস্টেশনে আবারো একযোগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে। এতে একজন রিক্সাচালক ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কেউ হতাহত না হ'লেও সরকার-প্রশাসন সহ গোটা দেশবাসীকে এটি নতুন করে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। বিস্ফোরণস্থল থেকে উদ্ধারকৃত অ্যালুমিনিয়ামের প্লেটে 'জাদীদ আল-কায়েদা' নামক একটি কথিত অজ্ঞাত সংগঠনের নাম পাওয়া গেছে। উক্ত প্লেটে কাদিয়ানী ও এনজিও কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে ১০ মের মধ্যে তাদের তৎপরতা বন্ধ করতে বলা হয়েছে। প্লেটটিতে খুদাই করে লিখা ছিল- *'মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও কাদিয়ানী ও এনজিও। এনজিওতে চাকরি করা এবং কাদিয়ানিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা হারাম। ১০ মে '০৭ ইংরেজী তারিখের মধ্যে এনজিওর চাকরি ছেড়ে দিতে হবে এবং কাদিয়ানিরা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হিসাবে মেনে নিতে হবে। উপরোল্লিখিত তারিখ পার করলে তোদের মৃত্যু অনিবার্য। নিবেদক জাদীদ আল-কায়েদা'।*

১৭ আগস্ট'০৫ দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার দীর্ঘ ২০ মাস ১৩ দিন পর পুনরায় একই আদলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে চরমভাবে উৎকণ্ঠায় ফেলে দিয়েছে। দেশব্যাপী আবারও বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এনজিও, রেলস্টেশন, সরকারী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সহ দেশের সর্বত্র নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পত্র-পত্রিকার পাতা আবারও জঙ্গী-বোমা ইত্যাদি শিরোনামে সরগরম হয়ে ওঠেছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্ষুণ্ন হয়েছে দেশের ভাবমূর্তি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশ তাদের স্বভাবসুলভ মন্তব্যও ছুঁড়ে দিয়েছে। 'জামা'আতুল মুজাহেদীন'-এর পর এবার লাইমলাইটে এসেছে 'জাদীদ আল-কায়েদা' নামের একটি নাম নাজানা অজ্ঞাত সংগঠন। যে নামের মধ্যেই রয়েছে একপ্রকার আন্তর্জাতিক ভীতি। যে নামকে পুঁজি করেই বিশ্বব্যাপী তথাকথিত সন্ত্রাস দমনের নামে চলছে নির্বিচার মুসলিম নিধন। ইরাক, ফিলিস্তীন, আফগানিস্তান যার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত। সুতরাং এমন একটি স্পর্শকাতর নাম ব্যবহার করেই স্বাধীন এই মুসলিম ভূখণ্ডটিকে কাবু করতে হবে এটিই কি শত্রুদের উদ্দেশ্য নয়? বাংলাদেশে আল-কায়েদা আছে দীর্ঘদিন থেকে এমন দাবীর পর এবার উক্ত নামে সামান্য পটকা সম তিনটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এবং অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে তথাকথিত দায়িত্ব স্বীকারের মাধ্যমে প্রথমত জানান দেওয়া

হয়েছে যে, বাংলাদেশে প্রকৃতই আল-কায়েদা নেটওয়ার্ক আছে। শুধু তাই নয় আল-কায়েদার নতুন সংস্করণ 'জাদীদ আল-কায়েদা' অর্থাৎ 'নতুন আল-কায়েদা' এখানে সক্রিয়। যদিও এর এক পার্সেন্ট সত্যতাও দেশের কোন বাহিনীই অদ্যাবধি উদ্ধার করতে পারেনি। উক্ত নামে কোন সংগঠনের অস্তিত্বও ইতিপূর্বে কেউ কোনদিন শুনেনি। তথাপি হঠাৎ করে এমন একটি নামধামহীন অজ্ঞাত সংগঠনের নামে বোমা হামলার মত দুঃসাহস কি করে সম্ভব হ'ল? এদের বোমার সরঞ্জাম ও অর্থ যোগানই বা আসে কোত্থেকে? এদের নেপথ্যনায়ক প্রকৃতপক্ষে কারা? এসব প্রশ্ন নতুন করে ধুম্রজাল সৃষ্টি করেছে সচেতন দেশবাসীকে।

বাংলাদেশ উদার মুসলিম দেশ হিসাবে আন্তর্জাতিক বিশ্বে সুপরিচিত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যও বিশ্বব্যাপী এদেশের রয়েছে খ্যাতি। শস্য-শ্যামল ছায়াঘেরা নদীমাতৃক অনিন্দ্য সুন্দর এই বাংলাদেশের ভূগর্ভে লুক্কায়িত আছে তেল-গ্যাস-কয়লা সহ বহু খনিজ সম্পদ। অজুত সম্ভাবনার এই সম্প্রীতিসুন্দর স্বাধীন ছোট্ট মুসলিম রাষ্ট্রটি যৎসামান্য রাজনৈতিক বিভেদ ব্যতিরেকে শান্তিপূর্ণভাবেই পরিচালিত হয়ে আসছিল অন্তত গত দশক পর্যন্ত। 'জঙ্গীবাদ' শব্দটির সাথেও পরিচিত ছিল না এদেশের আপামর জনতা। অথচ আজ সকলেই যেন এক অজানা আতঙ্কে ভুগছে। তবে কি দেশটি ইরাক-আফগানিস্তান, ফিলিস্তীন, লেবানন ও কাশ্মীরের ভাগ্য বরণ করতে যাচ্ছে। কারা এই ভয়াবহ পরিণতির দিকে দেশটিকে ঠেলে দিতে নেপথ্যে থেকে গুটি চালছে? নিশ্চয়ই এর পিছনে রয়েছে এক গভীর ষড়যন্ত্র। আছে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। রয়েছে তাদের মদদপুষ্ট দেশবিরোধী অশুভ চক্রের হিংস্র থাবা। নচেৎ দেশের চৌদ্দকোটি মানুষ যেখানে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ও সোচ্চার, সর্বস্তরের ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ যখন ইসলাম বিরোধী এই ন্যক্কারজনক পদক্ষেপের প্রকাশ্য বিরোধী তখন কি করে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত একশ্রেণীর অর্বাচিন তরুণের মাধ্যমে ইসলাম গর্হিত এধরনের রঙিন স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হ'তে পারে?

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। কোনরূপ চরমপন্থাকে ইসলাম সমর্থন করে না। বোমা মেরে সমাজে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ইসলামী পদ্ধতি নয়। ইসলামের সোনালী যুগেও এমন দৃষ্টান্ত ছিল না। আমাদের নবীকে আল্লাহপাক সশস্ত্র 'দারোগা' রূপে প্রেরণ করেননি *(গাশিয়াহ ২২)*। বরং তিনি এসেছিলেন জগদ্বাসীর জন্য 'রহমত' স্বরূপ *(আম্বিয়া ১০৭)*। জিহাদ ও জঙ্গীবাদ কখনো এক নয়। তাওহীদ বিরোধী আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধনই হ'ল সবচেয়ে বড় 'জিহাদ'। নবীগণ সেই লক্ষেই তাঁদের সমস্ত জীবনের সার্বিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত রেখেছিলেন। তারা কেউ অস্ত্র হাতে জনগণের সামনে উপস্থিত হননি। বরং যখনই শিরকের শিখণ্ডীরা অস্ত্র হাতে তাদেরকে উৎখাত করার জন্য উদ্যত হয়েছে, তখনই তাওহীদের অনুসারীগণ তাদের মুকাবেলায় হয় তাদের জীবন দিয়েছেন, নয় আত্মরক্ষা করেছেন, শহীদ অথবা গাযী হয়েছেন। বদর, ওহোদ, খন্দক সকল যুদ্ধই হয়েছে মদীনায় আত্মরক্ষামূলক। সুতরাং আজকেও যারা জিহাদের নামে প্রচলিত জঙ্গী তৎপরতায় লিপ্ত, যারা বোমা মেরে মানুষ হত্যা করে, আত্মঘাতি বোমার মাধ্যমে নিজেদের ধ্বংস করে তারা দেশ, জাতি, ইসলাম ও মানবতার দুশমন।

আমরা জঙ্গী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে আজকে নয়, বরং বিগত ২০০০ সাল থেকেই জোড়ালো ভাবে মৌখিক ও লিখিত প্রতিবাদ করে আসছি। দেশের ভবিষ্যৎ পরিণতি ভেবেই সরকার ও জনগণকে সাবধান করেছি। বিভ্রান্ত তরুণদেরকে ফিরে আসার জন্য কুরআন-হাদীছের আলোকে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেছি। ১৭ আগষ্ট বোমা হামলার পর বার বার দাবি উত্থাপন করেছি যে, বোমার সরঞ্জাম সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে খুঁজে বের করা হোক। এদের অস্ত্র ও অর্থ জোগানদাতাদের সনাক্ত করা হোক। সর্বোপরি শীর্ষ জঙ্গীদের গণমাধ্যমের মুখোমুখি করা হোক। এর কোন একটিও তখন অজ্ঞাত কারণে বাস্তবায়ন হয়নি। বোমার বিভিন্ন সরঞ্জামের মোড়কে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর বা লেবেল সাঁটা থাকলেও একই কারণে সরকার সেদিকে অগ্রসর হয়নি। ফলে বিষয়টি আজও রহস্যাবৃতই থেকে গেছে। অপরদিকে সন্দেহের অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে দেশের নিরপরাধ আলেম-ওলামাসহ শান্তিকামী সাধারণ মুসলমানদের উপর। ফলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও এদেশে মুসলিম পরিচয়ে বসবাস করাই যেন আজ কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠছে। নতুন নতুন জঙ্গী সংগঠনের তালিকা একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। এমনকি দীর্ঘ ৩০/৪০ বছর যাবত পরিচালিত কোন শান্তিপূর্ণ দ্বীনী সংগঠনকেও এরা জঙ্গী তালিকাভুক্ত করতে সামান্যতম কসুর করছে না। ধিক এধরনের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন রিপোর্টের। নিন্দা জানাই বিদেশী খুদ-কুঁড়ো খাওয়া এ সমস্ত সাংবাদিকদের, যারা উদ্ভট তথ্য পরিবেশন করে পানি ঘোলাটে করতে চায়।

পরিশেষে সরকারকে বলব, দেশের যে কোন সঙ্কট বা সমস্যা নির্মূল করতে হ'লে সর্বাগ্রে তার গোড়ায় হাত দিতে হবে। শুধুমাত্র গাছের ডালপালা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে কখনই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। জঙ্গীবাদের উৎস কোথায়, কী তাদের নীতি-আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, বাইরের কোন্ কোন্ দেশ বা দেশের গোয়েন্দা সংস্থা জঙ্গিদের সাহায্য করে, দেশের অভ্যন্তরে কারা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মদদ দিয়ে থাকে ইত্যাদি বিষয় খতিয়ে দেখতে হবে। অন্ধকারে ঢেল না ছুড়ে সঠিকভাবে অভিযান পরিচালনা করা হ'লে তবেই এই অশুভ শক্তির মূলোৎপাটন সম্ভব হবে। অন্যথায় নিরপরাধ মানুষের হয়রানিই শুধু বৃদ্ধি পাবে। বাস্তবে কোন ফল হবে না। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন- আমীন!!

আল্লাহ্‌র হক্ব

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ إِلاَّ مُؤَخَرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ! هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَّ يُعَذِّبَ مَنْ لاَّ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا.

অনুবাদঃ হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, আমি একই গাধার পিঠে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে আরোহী ছিলাম। এমতাবস্থায় আমার ও তাঁর মধ্যে হাওদার হেলান কাঠ ব্যতীত অন্য কিছুই ব্যবধান ছিল না। এমন সময় তিনি বললেন, হে মু'আয! তুমি কি জানো বান্দাদের উপরে আল্লাহ্‌র কি হক্ব রয়েছে এবং আল্লাহ্‌র উপরে বান্দাদের কি হক্ব রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বললেন, বান্দাদের উপরে আল্লাহ্‌র হক্ব এই যে, তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। অতঃপর আল্লাহ্‌র উপরে বান্দাদের হক্ব এই যে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দিবেন না, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি লোকদের এ বিষয়ে সুসংবাদ শুনিয়ে দেব না? তিনি বললেন, না। তুমি তাদের এ সুসংবাদ দিয়ো না। তাহ'লে ওরা (এই সুসংবাদের উপরে) নির্ভরশীল হয়ে পড়বে (আমল করবে না)'।[১]

রাবীর পরিচয়ঃ মু'আয বিন জাবাল বিন আমর বিন আউস বিন আয়েয বিন আদী আনছারী খাযরাজী। কুনিয়াত, আবু আব্দুর রহমান। ইনি মক্কার বায়'আতে আক্বাবায় অংশগ্রহণকারী বিখ্যাত ছাহাবী। তিনি আঠারো বছর বয়সে ইসলাম কবুল করেন এবং বদর যুদ্ধ সহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে যোগদান করেন। ধৈর্যশীলতা, লজ্জাশীলতা, দানশীলতা এবং দৈহিক অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠ আনছার যুবকদের অন্যতম ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। হালাল-হারাম ও অন্যান্য শারঈ আহকাম এবং কুরআনী জ্ঞানে তাঁকেই সর্বশেষ নির্ভরকেন্দ্র বলে বিবেচনা করা হ'ত। ওমর (রাঃ) বলেন, 'মহিলারা মু'আযের মত সন্তান প্রসবে অপারগ হয়ে গেছে। যদি মু'আয না থাকত, ওমর ধ্বংস হয়ে যেত'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ইয়ামনে ক্বাযী ও শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করেন। হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে তাঁকে ইয়ামনের গভর্ণর রূপে প্রেরণ করা হয়। একদল ছাহাবী ও তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি সর্বমোট ১৫৭টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তার মধ্যে ২টি মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ৩টি বুখারী ও ১টি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। তিনি ১৭ হিজরীতে ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে প্লেগ মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে সিরিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। এটিই অধিকাংশ বিদ্বানের বক্তব্য।[২]

সারমর্মঃ বান্দার উপরে আল্লাহ্‌র হক্ব হ'ল কেবলমাত্র তারই ইবাদত করা ও কাউকে শরীক না করা। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র উপরে বান্দার হক্ব হ'ল ঐ ব্যক্তিকে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে না রাখা।

হাদীছের ব্যাখ্যাঃ

كُنْتُ رِدْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي حِمَارٍ 'আমি একই গাধায় নবীর পিছনে সওয়ারী ছিলাম'। الردف اى العجز। সওয়ারীর পিছন অংশকে 'রিদ্‌ফ' বলা হয়। সেখান থেকে এসেছে الرديف অর্থাৎ 'পিছনে আরোহী'। রাসূলের উক্ত গাধাটির নাম ছিল 'উফায়ের' (عفير)। যেটি রাসূলকে উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছিলেন মিসরের খৃষ্টান অধিপতি মুক্বাওক্বিস (المقوقس) অথবা ফারওয়া বিন আমর।

(لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ إِلاَّ مُؤَخَرَةُ الرَّحْلِ) 'আমার ও তাঁর মধ্যে হাওদার হেলান কাঠ ব্যতীত কোন ব্যবধান ছিল না। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা উভয়ের মধ্যকার দূরত্বের পরিমাণ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ খুবই নিকটে। المؤخرة বলতে সীটের পিছনকার কাঠ বা লোহাকে বুঝানো হয়, যার উপরে আরোহী প্রয়োজনে ঠেস বা হেলান দিয়ে থাকেন। الرحل বা হাওদা কথাটি সাধারণতঃ উটের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মু'আয ঐ সময় রাসূলের সাথে তার গাধার পিঠে সওয়ারী ছিলেন।

১. *মুত্তাফাকুন আলাইহ, বুখারী অত্র হাদীছটি এনেছেন 'জিহাদ' 'অনুমতি গ্রহণ', 'হৃদয় গলানো' এবং 'তাওহীদ' অধ্যায়; মুসলিম ও তিরমিযী এনেছেন 'ঈমান' অধ্যায়ে এবং আবুদাঊদ এনেছেন 'জিহাদ' অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে; আলবানী, মিশকাত হা/২৪ 'ঈমান' অধ্যায়।*

২. *মির'আত ১/৮৮ পৃঃ।*

Contents

(حَـقُّ اللهِ عَلَـي الْعِبَـادِ أَنْ يَّعْبُـدُوْهُ وَلاَ يُـشْرِكُوْا بِـهِ شَـيْئًا) 'বান্দাদের উপরে আল্লাহ্‌র হক্ব এই যে, তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না'। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদত অবস্থায় অন্য কিছুকে শরীক করা যাবে না। ইবনু হিব্বান বলেন, عبـادة الله إقـرار باللسان وتـصديق بالقلـب وعمـل بـالجوارح 'আল্লাহ্‌র ইবাদত অর্থ হ'ল- মুখে স্বীকৃতি, হৃদয়ে গভীর বিশ্বাস ও কর্মে বাস্তবায়ন করা। এখানে ইবাদতের সাথে শিরক না করাকে শর্তযুক্ত করার মাধ্যমে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, শিরক মিশ্রিত ইবাদত নয়, বরং শিরক বিমুক্ত ইবাদত হ'তে হবে। কারণ শিরকের সঙ্গে তাওহীদের সম্পর্ক যেমন ওযূর সঙ্গে বায়ু নিঃসরণের সম্পর্ক। একটির বর্তমানে অপরটি থাকে না। অতএব ইবাদতের সঙ্গে যদি শিরক মিশ্রিত হয়ে যায় তাহ'লে সে ইবাদত আর নির্ভেজাল থাকে না এবং তা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বান্দাকে রক্ষা করবে না। মুশরিক ও ফাসিক মুসলমানরা যে কাজ সর্বদা করে থাকে।

(وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَي اللهِ أَنْ لاَّ يُعَذِّبَ مَنْ لاَّ يُشْرِكُ بِـهِ شَـيْئًا) 'আল্লাহ্‌র উপরে বান্দাদের হক্ব এই যে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দেবেন না, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না'। আল্লামা ত্বীবী বলেন, এর অর্থ তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে না। কেননা অন্যান্য ছহীহ হাদীছ সমূহে কবীরা গোনাহগার মুমিনের জাহান্নামী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। যদিও ঈমানের কারণে ও রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আতের কারণে অবশেষে আল্লাহ্‌র হুকুমে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে ছাহেবে মির'আত আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১৩২২-১৪১৪/১৯০৪-১৯৯৪) বলেন, এখানে ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই। কেননা অত্র হাদীছে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, শাস্তি না দেওয়ার বিষয়টি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর ইবাদত অর্থই হ'ল, মুখে স্বীকৃতি ও হৃদয়ে বিশ্বাস সহ আল্লাহ্‌র আনুগত্যপূর্ণ কাজ করা ও অবাধ্যতামূলক কাজ থেকে বিরত হওয়া। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে ব্যক্তি আদৌ আযাব ভোগ করবে না এবং প্রথমেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এক্ষণে হাদীছে বর্ণিত اتكـال বা 'ভরসা করা' অর্থ হবে স্রেফ হালাল-হারাম মেনে চলা ও ফারায়েয-ওয়াজিবাতের উপরে আমল করা এবং সুনান ও নাওয়াফেল ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ শুধু শাহাদাতায়েন উচ্চারণ ও ফারায়েয আদায় করাকে যথেষ্ট মনে করা এবং নফল সমূহ ছেড়ে দেওয়া বা তাতে গাফলতি করা। কারণ শুধুমাত্র শাহাদাতায়েন-কে যথেষ্ট মনে করে অন্যান্য আমল থেকে বিরত থাকা ও এর মাধ্যমে জাহান্নাম নিষিদ্ধ হওয়ার ধারণা করা সাধারণ মুসলমানদের থেকেই যেখানে আশা করা যায় না, সেখানে ছাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে কিভাবে আশা করা যায়? অত্র ব্যাখ্যার দলীল হিসাবে তিনি একই রাবী কর্তৃক তিরমিযী 'জান্নাতের বিবরণ' অধ্যায়ে এবং মিশকাত 'ঈমান' অধ্যায়ে হা/৪৭ (৪৬) মুসনাদে আহমদ বর্ণিত হাদীছ দু'টি উল্লেখ করেন। যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ প্রভৃতির উল্লেখের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

ذر الناس يعملون فإن في الجنة مائة درجة والفردوس أعلى الجنة وأوسطها قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس،

'হে মু'আয! লোকদের ছেড়ে দাও আমল করার জন্য। কেননা জান্নাতের একশতটি স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে 'ফেরদৌস' হ'ল সর্বোচ্চ ও মধ্যম। তিনি বললেন, অতএব যখন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকটে জান্নাতের প্রার্থনা করবে, তখন ফেরদৌস-এর প্রার্থনা করবে'।[৩]

আমরা মনে করি যে, যেহেতু অত্র হাদীছটির ব্যাখ্যা একই রাবী বর্ণিত অন্য হাদীছে এসেছে, সেহেতু ছাহেবে মির'আতের ব্যাখ্যা অগ্রগণ্য। তবে ঈমানের বরকতে অবশেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়ে বর্ণিত অন্যান্য ছহীহ হাদীছ সমূহের আলোকে আল্লামা ত্বীবী প্রদত্ত ব্যাখ্যা যথাস্থানে অবশ্যই প্রযোজ্য। কেননা বে-আমল মুমিন ব্যক্তি ফাসিক। কিন্তু প্রকৃত কাফির নয় এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। অতএব যারা একদিনের জন্যেও জাহান্নামের কঠিন আযাব ভোগ করতে চান না, বরং প্রথম সুযোগেই জান্নাতে যেতে চান, তাদের উচিত হবে কেবল কালেমা পড়ে নিশ্চিন্তে বসে না থেকে যথাযথভাবে নেক আমলে মনোনিবেশ করা ও অন্যায় কর্ম হ'তে বিরত থাকা। অনুরূপভাবে কেবল কালেমা পাঠ ও ফরয সমূহ আদায়ের মাধ্যমে জান্নাত লাভের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না থেকে তাদের কর্তব্য হবে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে সুন্নাত-নফল ও অতিরিক্ত নেক আমল সমূহ সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অধিকতর নৈকট্য হাছিলে ব্রতী হওয়া। যাতে সর্বোচ্চ জান্নাতের অধিকারী হওয়া যায়। হাদীছটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হ'তে পারে, যিনি ঈমান আনার পরপরই মৃত্যুবরণ করেন এবং আমল করার সুযোগ না পান কিংবা ঈমানের বিরোধী কোন আমল না করেন। ঐ ব্যক্তি শুধুমাত্র ঈমানের বরকতে জান্নাতবাসী হবেন।

حـق الله وحـق العبـاد -এর অর্থ ব্যাখ্যা করে ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, حـق الله بمعـني الواجـب والـلازم وحـق العباد بمعني الجدير واللائق 'আল্লাহ্‌র হক্ব' অর্থ ওয়াজিব

৩. *তিরমিযী*।

ও অপরিহার্য এবং 'বান্দার হক্ব' অর্থ যথাযোগ্য ও যথার্থ। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে পালনকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেনি এবং আল্লাহ্র ইবাদত ও তাঁর হক্ব সমূহ আদায়কে নিজের উপরে অপরিহার্য করে নিয়েছে, আল্লাহ্র নিকটে উক্ত ব্যক্তি যথার্থ ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু আল্লাহ্র উপরে কোন কিছুই ওয়াজিব নয়। যদিও এটি মু'তাযিলাদের মাযহাবের বিরোধী'। উল্লেখ্য যে, মু'তাযিলা মতবাদ অনুযায়ী নেককার বান্দাকে জান্নাতে দাখিল করা এবং বদকারকে জাহান্নামে দাখিল করা আল্লাহ্র উপরে ওয়াজিব। অথচ আল্লাহ্র উপরে কোন কিছুই ওয়াজিব নয়। 'তিনি যা খুশী করে থাকেন' (বুরূজ ১৬)।

(أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا) মু'আয বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি লোকদের এ বিষয়ে সুসংবাদ শুনিয়ে দেব না? তিনি বললেন, না। তাহ'লে ওরা (ঐ সুসংবাদের উপরে) নির্ভরশীল হয়ে পড়বে'। ছাহেবে মির'ক্বাত বলেন, أي يعتمدوا واتركوا الاجتهاد في حق الله تعالى অর্থাৎ তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র হক্ব আদায়ের ব্যাপারে যথাযথ চেষ্টা পরিত্যাগ করবে।

ত্বীবী বলেন, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মু'আয (রাঃ) হাদীছটি মৃত্যুর পূর্বে গুনাহের ভয়ে বর্ণনা করেন। ইলম প্রচারের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ এবং তা গোপন রাখার পরকালীন শাস্তি বিষয়ক হাদীছ তাঁকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাসূলের বর্তমান নিষেধাজ্ঞাটি ছিল সাময়িক, যা সময় ও অবস্থার পরিবর্তে পরিবর্তিত হয়। কেননা তখন লোকেরা নতুনভাবে মুসলমান হচ্ছিল। তারা বেশী বোঝা বহনে সক্ষম ছিল না। কিন্তু পরে যখন তাদের মধ্যে ঈমানী দৃঢ়তা আসল, তখন ইলম প্রচার করা ও তা গোপন না করার ব্যাপারে রাসূলের কঠোর নির্দেশ জারি হ'ল'। সেকারণ মু'আয (রাঃ) ইল্ম গোপন করার মহাপাপ হ'তে বাঁচার জন্য এবং ইলম প্রচারের বিরাট ছওয়াব লাভের আশায় মৃত্যুকালে অত্র হাদীছটি প্রকাশ করেন। এটি حديث اتكال নামে প্রসিদ্ধ।

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَي الرَّحْلِ، قَالَ يَا مُعَاذُ! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ يَا مُعَاذُ! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ يَا مُعَاذُ! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، ثَلاَثًا، قَالَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ صِدْقًا مِّنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَي النَّارِ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا؟ قَالَ إِذاً يَتَّكِلُوْا، فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا.

অনুবাদঃ আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন মু'আয বিন জাবাল গাধার পিঠে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হাওদার পিছনে আরোহী ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূল (ছাঃ) তাকে ডাক দিলেন, হে মু'আয! মু'আয জবাব দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি হাযির আছি ও প্রস্তুত আছি'। এভাবে তাকে তিনবার ডাকলেন ও তিনি তিনবার জবাব দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এমন কেউ নেই যে ব্যক্তি অন্তরের সাথে সত্য জেনে একথা ঘোষণা করবে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল'- আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন'। মু'আয বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি লোকদের এ খবর দিব না, যাতে তারা খুশী হয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। তাহ'লে তারা এর উপরে নির্ভর করে বসে থাকবে'। রাবী আনাস (রাঃ) বলেন, হাদীছ গোপন রাখার অপরাধে গোনাহগার হওয়ার ভয়ে মৃত্যুকালে মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হাদীছটি বর্ণনা করে যান'।[৪]

সারমর্মঃ কালেমায়ে শাহাদাতের স্বীকৃতি দানকারী ব্যক্তি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না।

হাদীছের ব্যাখ্যাঃ

(لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلاَثًا) 'আমি হাযির আছি হে আল্লাহ্র রাসূল এবং প্রস্তুত আছি'! لبيك আসলে ছিল لبينك- مضاف হওয়ার কারণে تثنيه এর نون পড়ে গেছে। একবচনে لَبًّا অর্থ أَجَابَ এখানে تثنيه আনা হয়েছে তাকীদের জন্য এবং বারবার ও সীমাহীন অধিকবার বুঝানোর জন্য। এক্ষণে لبيك অর্থ হবে أجبت لك إجابة بعد إجابة أو أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة অর্থঃ 'আমি আপনার ডাকে বারবার সাড়া দিতে প্রস্তুত'।

অনুরূপভাবে سعديك আসলে ছিল سَعْدَيْنَكَ একবচনে سعد। তাকীদ ও বারবার বুঝানোর জন্য تثنية আনা হয়েছে। অর্থঃ ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة অর্থাৎ 'আমি আপনার আনুগত্যের জন্য বারবার সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত'।

৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী 'ইলম' অধ্যায়ের শেষদিকে এবং মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়ে হাদীছটি এনেছেন; আলবানী, মিশকাত হা/২৫ 'ঈমান' অধ্যায়।*

ثَلاَثًا অর্থঃ قَالاَ قِيلاً ثلاثًا 'রাসূল ও মু'আয উভয়ে বললেন তিনবার করে'। অর্থাৎ وقع هذا النداء والجـواب ثلاث مرات 'এই সম্বোধন ও জওয়াব তিনবার করে হয়'।

مَا مِنْ أَحَدٍ يَـشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ اللهِ 'এমন কেউ নেই যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল'। ما হ'ল نفى -এর জন্য, مِنْ অতিরিক্তভাবে نفـى -এর তাকীদের জন্য এসেছে। أحـد 'মওছূফ' يـشهد বাক্যের শেষ পর্যন্ত 'ছিফাত'। উভয়ে মিলে 'মুবতাদা' এবং (الا حرمـه الله علـى النـار) 'খবর'।

صِدْقًا مِّنْ قَلْبِـهِ 'অন্তরের সাথে সত্য জেনে'। صِـدْقًا অর্থ صـادقا। মাছদার اسم فاعـل -এর অর্থে এসেছে। অর্থাৎ يـشهد صـادقا 'সাক্ষ্য দিবে সত্য সহকারে'। (مـن قلبـه) 'অন্তরের সাথে' এটি صـدقًا -এর ছিফাত বা বিশেষণ হয়েছে। কেননা সাক্ষ্য অনেক সময় অন্তর থেকে হয় না। যেমন মুনাফিকদের সাক্ষ্য।

(قَلْبِـهِ إِلاَّ حَرَّمَـهُ اللهُ عَلَـي النَّـارِ) 'আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন'। হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যে, কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণকারী সকল মানুষের জন্য হাজান্নামকে হারাম করা হয়েছে। অথচ এটি ঐ সকল ছহীহ হাদীছের বিরোধী, যেখানে বলা হয়েছে যে, তাওহীদপন্থী একদল কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর তারা রাসূলের শাফা'আতক্রমে বেরিয়ে আসবে। অতএব অত্র হাদীছের জবাব বিদ্বানগণ নিম্নরূপে দিয়েছেন। যেমন ইমাম বুখারী বলেন, এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছে। কিন্তু পরবর্তী একটি ফরয আদাযের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। কেউ বলেছেন, এখানে হারাম করা অর্থ জাহান্নামে চিরস্থায়ী অবস্থানকে হারাম করা। গোনাহগার মুমিনদের অস্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়নি। হাসান বাছরী বলেন, যে ব্যক্তি অন্তরের সাথে সত্য জেনে উক্ত সাক্ষ্য দেবে এবং সাক্ষ্যের দাবী অনুযায়ী যথাযথভাবে আমল করবে, সেই ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম হবে। আল্লামা ত্বীবীও অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, এখানে صـدقا অর্থ استقامةً বা দৃঢ়তা সহকারে। অর্থাৎ সাক্ষ্যের দৃঢ়তার সাথে সাথে আমলের দৃঢ়তা থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هـم المتقـون 'যিনি সত্য নিয়ে আগমন করেছেন (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ) এবং যারা তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে (অর্থাৎ মুসলমানগণ), তারাই হ'ল সত্যিকারের মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু' (যুমার ৩৩)। এখানে সত্য বলে মেনে নেওয়া অর্থ সত্যরূপে বাস্তবায়ন করা।

তবে এখানে শাহাদাতায়েনকে খাছ করে বর্ণনা করা হয়েছে এজন্য যে, এটিই হ'ল ঈমানের মূল স্তম্ভ। আর মূল না থাকলে শাখা সমূহের উদ্ভব কল্পনা করা যায় না। অতএব স্থায়ীভাবে হৌন বা অস্থায়ীভাবে হৌন জাহান্নাম হারাম হওয়ার পূর্বশর্ত হ'ল আন্তরিকভাবে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করা। আর সেজন্যই আবশ্যিক ও গুরুত্বের বিবেচনায় অত্র হাদীছে কেবল শাহাদাতায়েন-এর কথা বলা হয়েছে।

(إِذاً يَتَّكِلُـوْا) 'তাহ'লে তারা এর উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অত্র বক্তব্যের মধ্যেই আমলের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ কেবলমাত্র কালেমা শাহাদাতের উচ্চারণের ফলে মানুষের জন্য জাহান্নামকে হারাম করা হবে না। বরং কালেমার দাবী অনুযায়ী নেক আমল করতে হবে। অন্তরের সাথে কালেমার উচ্চারণ ও ফরয সমূহ আদায়ের সাথে সাথে সুন্নাত ও নফল সমূহ আদায়ের মাধ্যমে জান্নাতে সর্বোচ্চ স্তর হাছিলের চেষ্টায় ব্রতী হ'তে হবে। তবে কালেমায়ে শাহাদাতের আন্তরিক স্বীকৃতি হ'ল বান্দার উপরে জাহান্নাম হারাম হওয়ার আবশ্যিক পূর্বশর্ত।

(فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِـهِ تَأَثُّمًا) রাবী বলেন, 'অতঃপর মু'আয হাদীছটি বর্ণনা করে যান মৃত্যুকালে (হাদীছ গোপন রাখার) গোনাহের ভয়ে'। কেননা হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোন ইলম গোপন রাখবে, সে ব্যক্তি আগুনের লাগাম দ্বারা লাগামবদ্ধ হবে'।[৫] তাছাড়া উক্ত সুসংবাদ না দেওয়ার বিষয়টি اتـكـال। অর্থাৎ 'নির্ভরশীল হওয়ার' সাথে শর্তযুক্ত ছিল। এক্ষণে যখন মুসলমানগণ বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং শুধুমাত্র 'শাহাদাতায়েন'-এর উপরে নির্ভরশীল থাকার ভয় বিদূরিত হয়েছে, তখন অত্র হাদীছটি প্রকাশ করায় আর কোন বাধা ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন যে, হাদীছটি প্রকাশের নিষেধাজ্ঞাটি ছিল সাময়িক এবং পরিবেশের বিবেচনায়। এটা স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ছিল না। অতএব যখন সে পরিবেশ ও পরিস্থিতি দূর হয়ে গেছে, তখন ইলম প্রচারের সাধারণ নির্দেশের প্রতি আমল করে তিনি হাদীছটি বর্ণনা করে যান। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

---

৫. আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৩।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের করণীয়

*ডঃ মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল আলী**

[২য় কিস্তি]

ইক্বামতে দ্বীনের জন্য সশস্ত্র জিহাদঃ

দ্বীন ক্বায়েমের জন্য যে কোন ধরনের জঙ্গী তৎপরতার বৈধতা যে ইসলামে নেই, এর প্রমাণ রয়েছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়। মক্কায় যখন মুসলমানরা কাফির ও মুশরিকদের অবর্ণনীয় যুলুম ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন, তখন তাদের কেউ কেউ এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট শত্রুদের মুকাবেলা করার জন্য যুদ্ধের অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু তিনি তাদেরকে অনুমতি না দিয়ে মুশরিকদের ক্ষমা করে দিতে বললেন এবং ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিলেন। আবেগের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করার কথা মুখে বলা যত সহজ, বাস্তবে তা প্রয়োগ করা তত সহজ নয়। সেকারণ দেখা যায়, মাক্কী জীবনে যারা যুদ্ধের অনুমতি চেয়েছিলেন, মদীনায় গিয়ে সেখানে বিনা যুদ্ধে দ্বীন ক্বায়েম হওয়ার পর যখন তা রক্ষার প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে নেয়ার অনুমতি আসলো, এমনকি বাস্তবে যখন যুদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন সেই সব লোকদের মধ্য থেকে কিছু লোক এ কথা বলতে আরম্ভ করল যে, আল্লাহ তুমি যদি তা আরও বিলম্বে ফরয করতে, তাহ'লে কতই না ভাল হ'ত। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে সেসব মুসলমানদের এ জাতীয় কথার সমালোচনায় আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لاَ أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ–

'তুমি কি ঐ সমস্ত লোকদেরকে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, ছালাত ক্বায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক। অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ দেয়া হ'ল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল। যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমনকি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা! কেন আমাদের উপর জিহাদ ফরয করলে। আমাদেরকে কেন আরো কিছুকাল অবকাশ দিলে না' *(নিসা ৭৭)*।

এ আয়াতের শানেনুযূল সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কায় থাকাকালে আব্দুর রহমান ইবনু 'আউফ ও তাঁর কয়েক সাথী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা মুশরিক থাকাকালে সম্মানিত ছিলাম, অতঃপর যখন ঈমান আনয়ন করলাম, তখন অসম্মানিত হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, إِنِّىْ أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلاَ تُقَاتِلُوْا الْقَوْمَ–

'আমি ক্ষমার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি, কাজেই তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করো না'। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নবীকে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার পর যখন যুদ্ধের নির্দেশ করলেন, তখন তারা যুদ্ধ করা থেকে বিরত হয়ে গেল। তখন আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'মুমিনগণ ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে মক্কায় থাকাকালে ছালাত ও নেসাব বিহীনভাবে যাকাত দিতে, তাঁদের মধ্যকার অভাবী লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে এবং মুশরিকদের ক্ষমা করে দিয়ে ধৈর্যধারণ করতে আদিষ্ট ছিলেন। এ সময় তারা অন্তর্জ্বালায় ভুগতেন এবং মনে মনে চাইতেন, যদি তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হ'ত, তাহ'লে তারা (যুদ্ধ করে) শত্রুমুক্ত হ'তেন। অথচ তখন বিভিন্ন কারণবশত যুদ্ধ করা অনুচিত ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি কারণ হচ্ছেঃ

(ক) তখন শত্রুদের মুকাবেলায় তাদের সংখ্যা ছিল কম।

(খ) তখন তারা তাদের নিজ দেশে অবস্থান করছিলেন, যা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান। সেখানে যুদ্ধ করা ছিল অনুচিত। মদীনায় যাওয়ার পর যখন তারা বাড়ী, নিরাপদ স্থান ও সাহায্যকারী পেলেন, তখন যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হল। এমতাবস্থায় তারা যা চাইতো তা করতে যখন তাদেরকে নির্দেশ করা হ'ল, তখন তাদের মধ্যকার কিছু লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল এবং মানুষের মুকাবেলা করতে ভয় পেতে আরম্ভ করল'।[২]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ইক্বামতে দ্বীনের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের কোন আবশ্যকতা ইসলামে স্বীকার্য নয়। ইসলাম একটি কল্যাণ ও শান্তির ধর্ম। জনগণ যদি তাদের কল্যাণ না চায়, তাহ'লে গায়ে পড়ে তাদের কল্যাণ করার কোন আবশ্যকতা ইসলামে নেই। ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীরা যদি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিজ দেশে দ্বীন ক্বায়েম করতে চাওয়ার কারণে নিজ দেশে থাকতে অপারগ হন, তাহ'লে প্রয়োজনে তারা দেশ ত্যাগ করতে পারেন, তবুও দ্বীন ক্বায়েমের নামে অস্ত্র হাতে নিতে পারেন না। সেকারণ মক্কায় থাকাকালে সুদীর্ঘ তেরটি বছর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন অস্ত্র হাতে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। বরং এর পরিবর্তে প্রারম্ভে নিজের ঈমান বাঁচাতে হাবশায় এবং পরবর্তীতে দ্বীন ক্বায়েমের জন্য মদীনায় হিজরতের নির্দেশ করা হয়েছিল।

* *সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীছ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

১. *বায়হাক্বী, আহমাদ ইবনু হুসাইন, সুনানুল কুবরা; কিতাবুস সিয়ার, বাব নং ৫ (মক্কাতুল মুকাররমাহঃ দ্বারুল বায, ১৯৯৪ খ্রীঃ), ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১১।*

২. *ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহঃ ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রীঃ), ১/৫৩৮ পৃঃ।*

ইসলাম কখন যুদ্ধের অনুমোদন দেয়?

ইসলাম মোট পাঁচ পর্যায়ে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমোদন দিয়ে থাকে:

যুদ্ধ অনুমোদনের প্রথম পর্যায়ঃ

কোন দেশের বা এলাকার অধিকাংশ বা অর্ধেক অথবা অর্ধেকের কাছাকাছি লোক যদি স্বেচ্ছায় ইসলামে আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের দেশে শান্তিপূর্ণভাবে তা ক্বায়েম করতে চায় এবং তা ক্বায়েমের জন্য যে সব পূর্বশর্ত রয়েছে তা পূর্ণ করে, তাহ'লে আল্লাহ্র ইচ্ছায় সে দেশে অথবা অন্য কোথাও তাদের মাধ্যমে কোন রক্তপাত ছাড়াই দ্বীন ক্বায়েম হ'তে পারে। এভাবে শান্তিপূর্ণ পন্থায় কোথাও দ্বীন ক্বায়েম হওয়ার পর কেউ যদি তা ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধ করতে আসে, তখন মুসলমানদের সামনে তিনটি পথ খোলা থাকবেঃ

প্রথম পথঃ

এ সময় যদি দ্বীনের কর্মীদের আক্রমণকারী শত্রুদের মুকাবেলা করার মত প্রয়োজনীয় জনবল ও অস্ত্রবল থাকে, তাহ'লে তারা তাদের নেতার সাথে পরামর্শক্রমে তাঁর নির্দেশে শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত হবেন। এ জাতীয় যুদ্ধের অনুমোদন প্রসঙ্গেই মদীনায় নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়ঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا, وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ

'যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হ'ল এ কারণে যে, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অধিক সামর্থবান' *(হজ্জ ৩৯)*।

দ্বিতীয় পথঃ

মুসলমানদের যদি আগত শত্রুর মুকাবেলা করার মত শক্তি ও সামর্থ না থাকে, তাহ'লে ইমাম নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে শত্রুদের সাথে নিজেদের ঈমান বিধ্বংসী নয় এমন যেকোন শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হ'তে পারেন। খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনন্যোপায় হয়ে গাতফান গোত্রের নেতাদের সাথে মদীনার খর্জুরের এক তৃতীয়াংশ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। *(রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গাত্বফান গোত্রের নেতা উয়ায়নাহ ইবনু হিসন এবং হারিছ ইবনু আ'ওয়ারের সাথে মদীনার খেজুরের এক তৃতীয়াংশ প্রদানের মাধ্যমে চুক্তি করতে চেয়েছিলেন... এ ব্যাপারে সা'দ ইবনু মু'আয ও সা'দ ইবনু উবাদাহর সাথে তিনি পরামর্শ করেছিলেন। তারা উভয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ যদি আপনাকে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাহ'লে আমরা তা বিনা বাক্যে মেনে নেব। তা না হয়ে যদি আমাদের জন্য আপনি এমনিতেই এটি করতে চান, তাহ'লে আমাদের এমনটি করার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা এবং তারা সবাই যখন শিরক ও প্রতিমা পূজা করতাম, তখন তারা মেহমান হিসাবে অথবা ক্রয় করা ব্যতীত মদীনার খেজুর খেতে পারেনি। যখন আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করেছেন, আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন এবং আপনার দ্বারা আমাদেরকে সম্মান দান করেছেন, তখন আমরা তাদেরকে আমাদের সম্পদ দান করবো! আল্লাহ্র শপথ! তলোয়ার ব্যতীত তাদেরকে আর কিছুই দেব না)।*[৩] যদিও আনছারগণ এতে তাদের মানহানি হবে দেখে তা অনুমোদন করেননি। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে মুসলমানরা বৈষয়িক ক্ষতি স্বীকার করে হ'লেও শত্রুদের সাথে যেকোন সমঝোতায় আসতে পারেন। হুদায়বিয়ার সন্ধিও এ জাতীয় শান্তিচুক্তি করার জ্বলন্ত প্রমাণ।

তৃতীয় পথঃ

মুসলমানগণ চুক্তিতে আবদ্ধ হ'তে চাইলেও শত্রুরা যদি তা না মানে এবং যুদ্ধ করতে চায়, তখন তাদের পক্ষে এদের মুকাবেলা করার মত পরিস্থিতি না থাকলেও আল্লাহ্র উপর ভরসা করে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন। এতে আল্লাহ্র সাহায্য তাদের সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। এমতাবস্থায় দ্বীন রক্ষার্থে মুসলমানরা যুদ্ধে লিপ্ত হ'লে আল্লাহ তাদেরকে সহায়তা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। বদর, ওহোদে মুসলমানরা অনুরূপ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন বলেই তাদের জন্য আল্লাহ্র সহায়তা এসেছিল। উল্লেখ্য যে, এরূপ অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا لَقِيْتُمُوْا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوْهُمُ الْأَدْبَارَ، وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَال أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধের মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহ্র গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। বস্তুত সেটা হ'ল নিকৃষ্ট অবস্থান' *(আনফাল ১৫-১৬)*।

যুদ্ধ অনুমোদনের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ

একমাত্র আরব উপদ্বীপ ব্যতীত অন্যান্য সকল দেশে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের একত্রে নাগরিক হিসাবে সহাবস্থানের ক্ষেত্রে ইসলামের কোন বিধিনিষেধ নেই। তবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রয়োজনে তাদের উভয়ের মধ্যে যদি কোন চুক্তিপত্র থাকে, আর অমুসলিম কর্তৃপক্ষ যদি সে চুক্তির কোন ধারা অমান্য করে, তাহ'লে

৩. *ছফীউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৯৯৪ খ্রীঃ), পৃঃ ৩১১।*

মুসলিম কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সাথে কৃত শান্তিচুক্তি লঙ্ঘনের কারণেই বনী কায়নুকা, বনী নযীর ও বনী কুরায়যার ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। মক্কার অভিযানও মূলতঃ এ কারণেই পরিচালনা করেছিলেন।

যুদ্ধ অনুমোদনের তৃতীয় পর্যায়ঃ

মুসলিম কর্তৃপক্ষের নিকট কোন অমুসলিম কর্তৃপক্ষের ব্যাপারে যদি এ মর্মে সংবাদ পৌঁছে যে, তারা মুসলমানদের উপর আগ্রাসী হামলা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাহ'লে মুসলিম কর্তৃপক্ষ নিজেদের অবস্থা বিচারে সে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারেন। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু মুস্তালিকের অভিযানে বের হয়েছিলেন।

যুদ্ধ অনুমোদনের চতুর্থ পর্যায়ঃ

কোন অমুসলিম কর্তৃপক্ষ যদি প্রকাশ্যে বা গোপনে মুসলমানদের শত্রুদের কোন প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করে, তাহ'লে এমতাবস্থায়ও মুসলিম কর্তৃপক্ষ নিজেদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমন শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে পারেন। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খয়বরের যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। যেহেতু ইসলাম বিনা কারণে আগ্রাসী নীতিতে কারো রক্তপাত করাকে বৈধ মনে করে না, সেজন্য ইসলামের উপরোক্ত এ চার পর্যায়ের যুদ্ধই প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।

যুদ্ধ অনুমোদনের পঞ্চম পর্যায়ঃ

ইসলাম সর্বশেষ যে পর্যায়ে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করে তা হ'লঃ ইসলাম মানুষের কল্যাণের ধর্ম হওয়ায় ইসলাম চায় তা কেউ গ্রহণ করুক আর না করুক, অন্ততঃ এর দাওয়াত সবার কাছে পৌঁছাক। সেজন্য ইসলামের পথে দাওয়াত দান করা ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণ ও সরকারের একটি মহান দায়িত্ব। মুসলমানরা যেমন ব্যক্তিগতভাবে এ দায়িত্ব পালন করবেন, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারও কিছু ব্যক্তিদের মাধ্যমে এ দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মুসলমানরা যদি কোন বাধার সম্মুখীন হন, তাহ'লে দ্বিপাক্ষিক শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে তাঁরা সে বাধা দূর করার চেষ্টা করবেন। এমতাবস্থায় অমুসলিম কর্তৃপক্ষ যদি যুদ্ধের পথ বেছে নেয়, তাহ'লে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ করার মত শক্তি-সামর্থ থাকলে যুদ্ধের মাধ্যমে সে বাধা দূর করার ক্ষেত্রেও ইসলাম তাদেরকে অনুমতি দেয়। তবে সামর্থ না থাকলে নয়। ইসলামের ইতিহাসে এমন যুদ্ধের বহু নযীর রয়েছে। তৎকালীন রূম ও পারস্য এলাকায় মুসলমানদের যেসব যুদ্ধ হয়েছিল, সেসবই এ ধরনের যুদ্ধের আওতায় পড়ে। এ জাতীয় যুদ্ধের জন্য মুসলমানরা বাহ্যত দায়ী হ'লেও প্রকৃতপক্ষে তারা যেমন এ জন্য দায়ী নয়, তেমনি এমন যুদ্ধকে আগ্রাসী যুদ্ধও বলা যাবে না। কেননা মুসলমানদের ইসলামী দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্য তো অমুসলিমদের দেশ জয় করা ছিল না, তারা যদি ইসলাম কবুল করে নিত, তাহ'লে তাদের দেশের নেতৃত্ব তাদের হাতেই থেকে যেত। তাছাড়া মুসলমানরা তো সেখানে যুদ্ধের জন্য যায়নি, অমুসলিম কর্তৃপক্ষই তাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল।

মোটকথা, উপরোক্ত পাঁচটি পরিস্থিতিতে ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার জন্য ইসলাম মুসলমানদের জন্য প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের অনুমোদন প্রদান করে। দ্বীন ক্বায়েমের পূর্বে বা আগ্রাসী নীতিতে কোন যুদ্ধের অনুমোদন ইসলাম দেয় না। কুরআনে যুদ্ধ সংক্রান্ত যত আয়াত রয়েছে, সবই এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দান প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। দ্বীন ক্বায়েমের পূর্বে যুদ্ধের অনুমোদন প্রসঙ্গে তাতে একটি আয়াতও অবতীর্ণ হয়নি। তাই সংক্ষেপে এ কথা বলা যায় যে, **ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ হচ্ছেঃ কোথাও দ্বীন ক্বায়েম হওয়ার পর কেউ তা ধ্বংস করতে আসলে অথবা কেউ যদি মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি লঙ্ঘন করে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, অথবা কেউ যদি মুসলমানদের উপর হামলা করবে বলে শুনা যায়, অথবা কেউ যদি মুসলমানদের শত্রুদের সাহায্য করে অথবা দ্বীনের দাওয়াতের পথে বাধা দান করে কেউ যুদ্ধ করতে চায়, তাহ'লে দ্বীন রক্ষা করে আল্লাহ্‌র কালিমাকে সমুন্নত রাখার জন্য যে প্রতিরোধমূলক সশস্ত্র যুদ্ধ করা হয়, তাকেই ইসলামী জিহাদ বলা হয়**। যারা দ্বীন ক্বায়েমের জন্য প্রারম্ভেই সশস্ত্র জিহাদের পথ অবলম্বন করতে চায়, তাদের কর্মপন্থা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমোদিত পন্থা নয়। এ জাতীয় কর্মপন্থা অবলম্বনকারীরা ইসলামী জিহাদের অপব্যাখ্যাকারী বৈ আর কিছুই নয়। ইসলামী আইনের চোখে এরা যেমন অপরাধী, তেমনি প্রচলিত আইনের চোখেও এরা অপরাধী।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হ'ল যে, দ্বীন ক্বায়েমের জন্য কোন প্রকার জঙ্গী তৎপরতা প্রদর্শন করার কোন অনুমোদন ইসলামে নেই। যা কিছু আছে তা কেবল দ্বীন রক্ষার জন্য, শত্রুদের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে। এখন কারো মনে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হ'তে পারে যে, ইক্বামতে দ্বীনের জন্য যদি কোন জঙ্গী তৎপরতার অনুমোদন ইসলামে না থাকে, তাহ'লে দ্বীন কিভাবে ক্বায়েম হবে এবং দ্বীন ক্বায়েম না হ'লে মুসলমানদের করণীয়ই বা কি হবে?

কিভাবে দ্বীন ক্বায়েম হবে?

দ্বীন ক্বায়েমের বিষয়টি আল্লাহ্‌র একান্ত কাম্য হ'লেও তিনি তা কোন দৈব পন্থায় ক্বায়েম করার পক্ষপাতি নন। বরং তিনি চান স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তা ক্বায়েম হোক। সেজন্য তিনি দ্বীন ক্বায়েম হওয়ার বিষয়টিকে কতিপয় পূর্বশর্তের উপর নির্ভরশীল করে রেখেছেন। মুসলমানরা

যদি সেসব শর্ত কখনও পূর্ণ করতে সক্ষম হয়, তাহ'লে তিনি তা ক্বায়েম করে দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যেমনটি করেছিলেন ইসলামের সোনালী যুগে।

ইক্বামতে দ্বীনের পূর্বশর্তঃ

প্রথম শর্তঃ যথার্থ মুমিন হওয়া

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। যারা ইক্বামতে দ্বীনের কর্মী হবেন, তারা যথার্থ মুমিন হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা, তাঁর সকল রাসূল ও ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাব সমূহ, তাক্বদীর ও পরকালের উপর আন্তরিক এবং মৌখিকভাবে বিশ্বাস ও স্বীকৃতি প্রদান করবেন। এ ছয়টি বিষয়কে ঈমানের মূল বা রুকন বলা হয়। এ বিষয়গুলো এমন যে, এগুলোর প্রতি বিশ্বাস ও স্বীকৃতি ব্যতীত কেউ মুমিন হ'তে পারে না।

আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করার অর্থ শুধু তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করাই নয়, কেননা এটুকু বিশ্বাস করে কেউ মুসলিম হ'তে পারে না। আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার যে ৯৯টি নাম রয়েছে, সেসব নামের বৈশিষ্ট্যগুণে তাঁকে সকলের প্রভু হিসাবে বিশ্বাস করতে হবে। তাঁকে এককভাবে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা, রোগদাতা ও রোগ থেকে মুক্তিদাতা, জীবন পরিচালনার জন্য আদেশ ও নিষেধের বিধানদাতা, সকল দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, সবকিছু শ্রবণকারী ও পরিচালনাকারী বলে বিশ্বাস করতে হবে। এসব বৈশিষ্ট্যে তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার কাউকে তাঁর শরীক বা সমকক্ষ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাঁকে একক প্রভু হিসাবে বিশ্বাস করে এককভাবে তাঁরই উপাসনা করতে হবে। দেহের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখ ও অন্তর দিয়ে কেবল তাঁরই উপাসনা করতে হবে। তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতির বাইরে কোন বস্তু বা কাউকে উপকারী বা অপকারী বলে মনে করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এ জগত পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোন নবী, অলী, গাউছ বা কুতুবের শাফা'আত কার্যকরী হয় না বলে বিশ্বাস করতে হবে। এভাবে সমাজে জ্ঞানগত, পরিচালনাগত, উপাসনাগত ও অভ্যাসগত যত শিরকের প্রচলন রয়েছে, তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ্র রুবুবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতে বিশ্বাসী হ'তে হবে।

ইক্বামতে দ্বীনের প্রতিটি কর্মীকে উপরোক্ত বিশ্বাসের আলোকে তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করতে হবে। এর ব্যতিক্রম করলে তারা যেমন মুসলিম হ'তে পারবেন না, তেমনি ইক্বামতে দ্বীনের জন্য প্রথম যে পূর্বশর্ত রয়েছে, তাও তাদের দ্বারা পূর্ণ হবে না। ফলে এমন কর্মীদের দ্বারা দ্বীনও ক্বায়েম হবে বলে আশা করা যায় না। কেননা যারা প্রকৃতপক্ষে মুমিন হ'তে পারেনি, তাদের মাধ্যমে দ্বীন ক্বায়েম করে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র কোন প্রতিশ্রুতি নেই।

দ্বিতীয় শর্তঃ আমলে ছালেহ করা

আমলে ছালেহ অর্থঃ সঠিক ও শুদ্ধ কাজ। এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এতে যেমন রয়েছে মানুষের নিজের আত্মার অধিকার, তেমনি তাতে রয়েছে আল্লাহ ও মানুষের সাথে সম্পর্কিত অধিকার সমূহ।

আত্মার অধিকারঃ

ইক্বামতে দ্বীনের প্রত্যেক কর্মী যথার্থ ঈমান আনয়নের পর নিজ আত্মার অধিকারের প্রতি নযর দিবেন। প্রত্যেকে স্বীয় আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে সমাজে একেকজন সৎ, চরিত্রবান ও যোগ্য মানুষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। দুনিয়ার প্রতি অস্বাভাবিক মোহ পরিত্যাগ করে, চরিত্রে কালিমা লেপন হ'তে পারে এমন যে কোন ধরনের অপরাধজনিত কর্ম হ'তে তারা বিরত থাকবেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাদের নিয়োগ করা হ'লে সততা ও নিষ্ঠার সাথে তা আঞ্জাম দিয়ে তারা নিজেদেরকে দেশের একজন সৎ ও যোগ্য নাগরিক হওয়ার চেষ্টা করবেন। সৎ চরিত্রের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি সমাজের সাধারণ মানুষের কাছেও অধিক গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবেন।

আল্লাহ্র অধিকারঃ

আল্লাহ্র অধিকার বলতে তাঁর ইবাদত এবং আমাদের সার্বিক জীবনকে তাঁর আনুগত্যশীল করার জন্য তিনি যেসব বিধি-বিধান আরোপ করেছেন সেগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে। ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীরা তাদের মুখ, দেহের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অন্তর দিয়ে একমাত্র তাঁরই উপাসনা ও আনুগত্য করবেন। তাঁর উপাসনা ও আনুগত্যে কাউকে শরীক করা থেকে বিরত থাকবেন। কেননা তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন বিধায়, আমাদের উপর তাঁর এ অধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এথেকে আমাদের অব্যাহতি পাবার যেমন কোন সুযোগ নেই, তেমনি তাতে কাউকে শরীক করারও কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ্র এ অধিকার যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও আদায় করা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য হওয়ার কারণে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এ বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত জোর দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَتُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، 'তোমরা আল্লাহ্র উপাসনা কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না' *(নিসা ৩৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَيُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، 'বান্দার উপর আল্লাহ্র অধিকার হচ্ছে তারা যেন তাঁর উপাসনা করে এবং তাঁর উপাসনায় কাউকে তাঁর সাথে শরীক না করে'।[৪]

---

৪. *মুসলিম, 'কিতাবুল ঈমান' হা/৩০, ১/৫৯ পৃঃ।*

যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করবেন, তারা আল্লাহ্‌র উপাসনা ও আনুগত্যে কাউকে শরীক করা থেকে বাঁচতে হ'লে যেমনি ছালাত, ছিয়াম ও হজ্জ পালন করবেন, তেমনি সমাজে সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি প্রবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন। সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার রাজনীতির পরিবর্তে ইসলামী রাজনীতি করবেন।

মানুষের অধিকারঃ

মানুষের অধিকার বলতে মানুষের পারস্পরিক কল্যাণে শরী'আতের করণীয় ও বর্জনীয় বিধান সমূহকে বুঝানো হয়ে থাকে। আমাদের পারস্পরিক কল্যাণে আল্লাহ তা'আলা যেসব বিধান দিয়েছেন, ইক্বামতে দ্বীনের কর্মীগণ তা সাধ্যানুযায়ী পালন করবেন এবং যেসব বর্জনীয় বিধান দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবেন। তারা দ্বীন ক্বায়েমের কথা বলায় সমাজের মানুষের দ্বারা তাদের কোন অধিকার খর্ব হ'লেও তারা কারো অধিকার খর্ব করা থেকে বিরত থাকবেন। তারা হবেন সমাজের মানুষের অধিকার সংরক্ষণের অতন্দ্রপহরী।

বিদ'আত বর্জনঃ

উপরোক্ত তিনটি অধিকার এবং করণীয় ও বর্জনীয় উপাসনাদি করতে গিয়ে তারা যেকোন ধরনের বিদ'আত থেকে বিরত থাকবেন। ইসলামের কোন মূল্যবোধই পরিবর্তনযোগ্য নয় বলে যে সমস্ত মূল্যবোধকে সৎ চরিত্রের উপাদান বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিহ্নিত করেছেন, তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন আনয়ন করা থেকে তারা নিজেরা বিরত থাকবেন, কেউ তা করতে চাইলে তারা সাধ্যানুযায়ী তাতে বাধা দান করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের আদর্শ হিসাবে তিনি আল্লাহ্‌র অধিকার আদায় করতে গিয়ে ফরয ও নফল উপাসনা সমূহ যতটুকু যেভাবে করেছেন, তা ঠিক সেভাবেই করবেন। তাতে যেকোন ধরনের সংযোজন বা বিয়োজন করা থেকে বিরত থাকবেন।

আমল কিভাবে সঠিক হয়?

সর্বদা মনে রাখবেন যে, কোন কর্ম আল্লাহ্‌র কাছে সঠিক বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। তা যদি না হয়, তাহ'লে তাদের সে আমল দেখতে খুব সুন্দর হ'লেও এবং কোন কোন আলিম ও সাধারণ মুসলমানদের দ্বারা তা গৃহীত হয়ে থাকলেও যেমন তা সঠিক বলে গণ্য হবে না, তেমনি এমন আমল করার কারণে তারা দ্বীনের কর্মী হিসাবেও গণ্য হ'তে পারবেন না। উপরন্তু তাদের এ কর্ম বিদ'আত হিসাবে গণ্য হওয়ার কারণে তারা পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা না করলে তাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।

মুমিন জীবনে মধ্যপন্থা অবলম্বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

[২য় কিস্তি]

চরিত্র-মাধুর্যে মধ্যপন্থা অবলম্বনঃ

আক্বীদা-বিশ্বাস ও ইবাদতে যেমন মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে তেমনি আচার-আচরণ, চাল-চলন সহ সকল কর্মকাণ্ডে মধ্যপন্থা অবলম্বনের জন্য ইসলামে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(ক) চাল-চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বনঃ মানুষের চাল-চলনে অনেক সময় গর্ব-অহংকার প্রকাশ পায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে পৃথিবীতে অহংকারবশে চলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً–

‘পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই তুমি কখনোই ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনোই পর্বত প্রমাণ হ’তে পারবে না’ *(বানী ইসরাঈল ৩৭)*।

পক্ষান্তরে চাল-চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ–

‘চাল-চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, কণ্ঠস্বরকে নিম্নগামী রাখ। নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট আওয়ায হচ্ছে গাধার আওয়ায’ *(লোক্বমান ১৯)*। হাফিয ইবনু কাছীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

أي امش مقتصدًا مشيًا ليس بالبطئ المتثبط ولا بالسريع المفرط بل عدلا و وسطًا بين بين.

অর্থাৎ ‘মধ্যম গতিতে চল। অতি দ্রুতও নয়, আবার নিতান্ত আস্তেও নয়, বরং শান্ত-শিষ্টভাবে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলতে হবে’।[১০]

চাল-চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلسَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّوَدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ–

‘উত্তম চাল-চলন, ধীরস্থিরতা এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের একভাগ’।[১১] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ قَالَ إِنَّ الْهَدْىَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالْاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِّنْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ–

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ‘সচ্চরিত্রতা, উত্তম চাল-চলন এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ’।[১২]

খ. কথাবার্তায় মধ্যপন্থা অবলম্বনঃ কথাবার্তায় কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার জন্যও আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

‘কণ্ঠস্বরকে নিম্নগামী রাখ। নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট আওয়ায হচ্ছে গাধার আওয়ায’ *(লুক্বমান ১৯)*। এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه.

অর্থাৎ ‘কথাবার্তায় অতিরঞ্জিত করো না, কণ্ঠস্বর উচ্চ করো না, যাতে কোন উপকারিতা নেই’।[১৩]

মুজাহিদ সহ আরো অনেকে বলেন, নিশ্চয়ই আওয়াযের মধ্যে গাধার আওয়ায অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অর্থাৎ উচ্চ কণ্ঠস্বরকে গাধার উচ্চ আওয়াযের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর এটা আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত অপসন্দনীয় ও ঘৃণিত।[১৪]

চিৎকার, চেঁচামেচি ও কর্কশতা পরিহার এবং বিশুদ্ধ ও নম্রভাষায় কথা বলার নির্দেশই উক্ত আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সমাজে এমন কিছু লোক আছে যারা, কথা বলতে গেলেই চিৎকার করে কথা বলে। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলাই তাদের অভ্যাস। তারা নিজেদের পরিবার-পরিজনের সাথে যেমনভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে তেমনিভাবে আলেম-ওলামা, সমাজের গণ্যমান্য, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথেও অনুরূপভাবে কথা বলে। আল্লাহ তা‘আলা এগুলি পরিহার করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

* *পি-এচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১০. *ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩য় খণ্ড, (বৈরুতঃ আল-ইরফান, ১ম মুদ্রণঃ ১৯৯৬/১৪১৬ হিঃ), পৃঃ ৪৪৭।*

১১. *মিশকাত হা/৫০৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৩৮।*

১২. *মিশকাত হা/৫০৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৩৯; আবুদাঊদ হা/৪৭৭৬।*

১৩. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৭।*

১৪. *প্রাগুক্ত।*

يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَتَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَتَشْعُرُوْنَ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উচুঁ করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না' *(হুজুরাত ২)*। ওলামায়ে কেরাম নবীগণের উত্তরসূরী হিসাবে তাদের সাথেও বিনয় ও নম্রতার সাথে কণ্ঠস্বর নিচু রেখে কথা বলতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কথাবার্তায় অহংকার প্রকাশ ও অন্যকে তুচ্ছ করে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَىَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَىَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ: قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ؟ قَالَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ-

'ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্য থেকে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও সবচেয়ে নিকটে উপবিষ্ট হবে সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে ভাল। আর ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্য থেকে আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য ও আমার থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী হবে সেইসব লোক, যারা দ্বিধা সহকারে কথা বলে, কথার মাধ্যমে অহংকার প্রকাশ করে এবং যারা 'মুতাফাইহিকূন'। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দ্বিধান্বিত বাক্যালাপকারী ও কথার মাধ্যমে অহংকার প্রকাশকারীর অর্থ তো বুঝলাম, কিন্তু 'মুতাফাইহিকূন' কারা? তিনি বললেন, অহংকারী ব্যক্তিরা'।[১৫]

উল্লিখিত হাদীছের কতিপয় শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,

الثرثار هو كثير الكلام تكلفًا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه، ويتكلم بملء فيه تفاصحًا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق: أصله من الفهق وهو الامتلاء وهو الذى يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه، ويغرب به تكبرًا وارتفاعًا واظهارًا للفضيلة على غيره-

১৫. *ইমাম তিরমিযী, সুনানুত-তিরমিযী (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরেফ, ১ম প্রকাশ, তা.বি.), পৃঃ ৪৫৬-৫৭, হা/২০১৮।*

'আছ-ছারছারু' বলতে ঐ লোককে বুঝায়, যে অত্যধিক কৃত্রিমভাবে কথা বলে থাকে। 'আল-মুতাশাদ্দিক্ব' ঐ লোককে বলে, যে নিজের কথার দ্বারা অন্যের উপর নিজের প্রাধান্য ও বড়াই প্রকাশ করে এবং কথাবার্তা বলার সময় নিজের কথার বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে থাকে। 'মুতাফাইহিকূন' শব্দটি 'ফাহকূন' ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ মুখ ভর্তি করা বা পূর্ণ করা। কাজেই 'আল-মুতাফাইহিকূন' বলতে ঐ লোককে বুঝায়, যে মুখ ভর্তি করে কথা বলে এবং তাতে বাড়াবাড়ি করে, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে এবং নিজের অহংকার ও আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশের উদ্দেশ্যে কথা বলে।[১৬]

সচ্চরিত্রের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিরমিযী (রহঃ) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি উল্লেখ করেন,

هو طلاقة الوجه وبذل المعروف، وكف الأذى،

'সচ্চরিত্র হ'ল হাসি-খুশি মুখ, সত্য-ন্যায়কে অবলম্বন করা এবং অন্যকে কোনরূপ কষ্ট দেয়া থেকে বেঁচে থাকা'।[১৭]

কথাবার্তায় অশ্লীল ভাষা ব্যবহারকারীকে আল্লাহ পসন্দ করেন না। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَثْقَلَ شَىْءٍ يُوْضَعُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلْقُ حَسَنٌ وَإِنَّ اللهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىِّ-

আবুদ দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিসটি রাখা হবে, তা হ'ল উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলভাষী দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন'।[১৮]

(গ) আচার-ব্যবহারে মধ্যপন্থা অবলম্বনঃ মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা আচার-ব্যবহারে বিনয়ী ও নম্র হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ،

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ঈমানদার হয় সরল ও ভদ্র, পক্ষান্তরে পাপী হয় ধূর্ত ও হীন চরিত্রের'।[১৯]

১৬. *রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ২৩৩।*

১৭. *সুনানুত-তিরমিযী, পৃঃ ৪৫৭; রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ২৩৩।*

১৮. *তিরমিযী, হা/২০০৩ ও ২০০৪; মিশকাত হা/৫০৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৫৯।*

১৯. *তিরমিযী, আবুদাঊদ হা/৪৭৯০; মিশকাত হা/৫০৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৬৩ 'কোমলতা, লাজুকতা ও সচ্চরিত্রতা' অনুচ্ছেদ।*

Contents

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُوْنَ هَيِّنُوْنَ لَيِّنُوْنَ كَالْجَمَلِ الْأَنْفِ اِنْ قِيْدَ اِنْقَادَ وَأُنِيْخَ عَلَى صَخْرَةٍ اِسْتَنَاخَ،

মাকহূল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঈমানদারগণ নাকে রশি লাগানো উটের ন্যায় সরল, সহজ ও কোমল স্বভাবের হয়। যখন তাকে টানা হয়, তখন সে চলে। আর যদি তাকে পাথরের উপর বসাতে চাওয়া হয়, তাহ'লে সে তার উপর বসে পড়ে'।[20]

আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিনয়ী ও পরস্পরের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ– 'যারা তোমার অনুসরণ করে, সেসমস্ত বিশ্বাসীর প্রতি সদয় হও' *(শু'আরা ২১৫)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ،

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ তার দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং আল্লাহ হবেন তাদের প্রিয়। তারা মুমিনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর' *(মায়েদা ৫৪)*।

উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম মানুষকে আচার-ব্যবহারে কঠোর ও রুক্ষ না হয়ে কোমল ও নম্র হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَلْجَوَّاظُ وَلاَالْجَعْظَرِيُّ،

'কঠোর ও রুক্ষ-স্বভাবের ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[21] আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،

'আল্লাহ্‌র রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রুক্ষ ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হ'তেন, তাহ'লে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে চলে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন ও তাদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করুন এবং তাদের সাথে বিভিন্ন কাজে পরামর্শ করুন' *(আলে ইমরান ১৫৯)*।

আচার-আচরণে বিনয়ী ও বিনম্র হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীছ উপস্থাপন করা হ'ল-

عَنْ عَيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَيَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَيَبْغِى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ،

আয়ায ইবনু হিমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ আমার নিকট অহি পাঠিয়েছেন যে, তোমরা পরস্পরের সাথে বিনয় ও নম্র আচরণ করো, এমনকি কেউ কারো উপর গৌরব করবে না এবং একজন আরেকজনের উপর বাড়াবাড়ি করবে না'।[22]

عن أبى هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। বান্দার ক্ষমার গুণ দ্বারা আল্লাহ তার ইযযত ও সম্মান বৃদ্ধি করেন। কেউ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করলে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন'।[23]

প্রকাশ থাকে যে, সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা অতি কঠোর ও রুক্ষ স্বভাবের এবং তারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কর্কশ ব্যবহারেরও অধিকারী। অনেকে আছে অতি নির্দয় ও অশালীন। আবার কেউ আছে শান্ত-শিষ্ট, নম্র ও বিনয়ী। এসব দোষ-ত্রুটি ছোট-বড় সবার মাঝে থাকতে পারে। মুমিনের আচার-ব্যবহার হবে অতি কোমল ও অতি কঠোরতার মধ্যবর্তী। কেননা অতি বিনয়ী হ'লে অধিকার বঞ্চিত হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাচারিত হবে। আর অতি কঠোর হ'লে মানুষ তার নিকট থেকে দূরে সরে যাবে। এজন্য মুমিনদের যথার্থ বিনয়ী-নম্র, কোমল, শান্ত-শিষ্ট ও দয়ার্দ্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা

২০. *তিরমিযী; মিশকাত হা/৫০৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৬৪।*

২১. *আবুদাউদ, হা/৪৮০১; মিশকাত হা/৫০৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৫৮।*

২২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮৯৮, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়; রিয়াযুছছালেহীন, হা/৬০২।*

২৩. *ছহীহ মুসলিম, (রিয়াযঃ দারুস সালাম, ২য় প্রকাশ, ২০০০/১৪২১ হিঃ), পৃঃ ১১৩১; হা/৬৪৯২; রিয়াযুছছালেহীন, হা/৬০৩।*

মুমিনের বৈশিষ্ট্য বিরোধী। আচার-ব্যবহারে বিনয়ী ও নম্র হওয়ার পাশাপাশি অহংকার, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি পরিহার করতে হবে। এসব মানব চরিত্রের দুষ্টক্ষত। এগুলি মানুষকে মনুষ্যত্বের স্তর থেকে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দেয়। এজন্য ইসলাম মানুষকে ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহ দাম্ভিকতা পরিহারকারীদের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَ يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ-

'এটা আখেরাতের সেই আবাস, যা আমি নির্ধারণ করি তাদের জন্য, যারা এ পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য হ'তে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্য' *(ক্বাছাছ ৮৩)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَلاَتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ-

'অবজ্ঞা ভরে তুমি লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না এবং পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না। আল্লাহ কোন অহংকারী দাম্ভিককে পসন্দ করেন না' *(লুক্বমান ১৮)*।

মহান আল্লাহ অহংকারীর ভয়াবহ পরিণতি অবহিত করার জন্য কুরআন মাজীদে কারূণের ঘটনা নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেছেন-

'কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি যুলুম করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম ধন-ভাণ্ডার, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর! তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদের পসন্দ করেন না। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তা দ্বারা পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান করো এবং ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগ তুমি উপেক্ষা করো না। তুমি সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি সদাশয় হয়েছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না। সে বলল, এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানত না, আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? অপরাধীদের তাদের অপরাধ সম্পর্কে (তা জানার জন্য) প্রশ্ন করা হবে না। কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহা কারূণকে যা দেয়া হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেয়া হ'ত! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান। যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহ্র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ছাড়া তা কেউ পাবে না। এরপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে তলিয়ে দিলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহ্র শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। গতকাল যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা প্রত্যুষে বলতে লাগল, হায়, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন ও হ্রাস করেন। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে, আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। হায়, কাফেররা সফলকাম হবে না' *(ক্বাছাছ ৭৬-৮২)*।

অহংকারীর পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ،

'যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জনৈক ছাহাবী বললেন, কোন লোক তো চায় যে, তার কাপড়টা সুন্দর হোক, জুতাটা আকর্ষণীয় হোক (এটাও কি খারাপ)? তিনি বললেন, আল্লাহ নিজে সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন। অহংকার হ'ল গর্বভরে সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে হেয় জ্ঞান করা'।[২৪]

অন্যত্র তিনি বলেন,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ زَنِيْمٍ مُسْتَكْبِرٍ.

'আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের বিষয়ে সংবাদ দিব না? তারা হ'ল, প্রত্যেক অহংকারী, সীমালংঘনকারী, বদবখত ও উদ্ধত লোক'।[২৫]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, আচার-ব্যবহারে অহংকার, দাম্ভিকতা, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি পরিহার করা এবং বিনয়ী ও নম্র হওয়া মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোমল, তিনি কোমলতা পসন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِيْ الْأُمُوْرِ كُلِّهِ.

'আল্লাহ কোমল ও মেহেরবান। তাই প্রতিটি কাজে তিনি কোমলতা ও মেহেরবানী পসন্দ করেন'।[২৬]

---

২৪. *মুসলিম, হা/২৬৫ (৯১); রিয়াযুছছালেহীন হা/৬১২; আবুদাঊদ হা/৪০৯১*।

২৫. *মুসলিম হা/৭১৮৯; মিশকাত হা/৫০৮৪; রিয়াযুছছালেহীন হা/৬১৪*।

২৬. *বুখারী, মুসলিম হা/২১৬৫; রিয়াযুছছালেহীন হা/৬৩৩*।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِيْ عَلَى مَا سِوَاهُ.

'আল্লাহ স্বয়ং কোমল ও সহানুভূতিশীল। তিনি কোমলতা ও সহানুভূতিশীলতাকে ভালবাসেন। তিনি কোমলতার মাধ্যমে এমন জিনিস দান করেন, যা কঠোরতার দ্বারা দেন না। আর কোমলতা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তিনি তা দেন না'।[২৭]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِيْ شَيْئٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعَ مِنْ شَيْئٍ إِلاَّ شَانَهُ.

'যে জিনিসে কোমলতা থাকে, কোমলতা সেটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর যে জিনিস থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেয়া হয়, সেটাই দোষ-ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়'।[২৮]

(ঘ) মানুষের সাথে সংশ্রব ও মেলামেশায় মধ্যপন্থা অবলম্বনঃ

মানুষের সাথে মেলামেশায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। কোন কোন মানুষ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী থাকা পসন্দ করে, কারো সাথে মিশতে চায় না। ফলে লোকজনও তার সঙ্গ পরিহার করে। আবার অনেকে আছে অত্যন্ত সঙ্গপ্রিয়, আড্ডাবাজ। তারা একাকী থাকতে পারে না, মানুষের সাথে মেলামেশা ও আড্ডায় তারা অধিকাংশ সময় নষ্ট করে। এমনকি বাজারে ও ক্লাবেই তাদের সময় কাটে। সভা-সমিতি, মিটিং-মিছিল ইত্যাদিতে তারা মশগূল থাকে। নিজের জন্য ও পরিবার-পরিজনের জন্য চিন্তা করার তাদের কোন ফুরসত থাকে না। এসবই বাড়াবাড়ি। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা হচ্ছে প্রয়োজনে সাধ্যমত মানুষের সাথে মেশা বা তাদের সংস্পর্শে আসা এবং বিনা প্রয়োজনে তাদের সঙ্গ পরিহার করা। যাতে একেবারে জনবিচ্ছিন্ন না হয় এবং তাদের সাথে মত্ত হয়ে স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্যও ভুলে না যায়। তাই এক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা অতীব যরূরী। আর মানুষের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে সৎ, শিক্ষিত, মার্জিত, ভদ্র, শালীনদের সাথে সংশ্রব রাখাই উত্তম। অসৎ, অভদ্র, অশালীন, অশিক্ষিত ও মূর্খদের সাহচর্য পরিহার করা বা তাদের থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ.

'ক্ষমাশীলতা অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দান কর এবং মূর্খ লোকদের এড়িয়ে চলো' *(আ'রাফ ১৯৯)*।

মুসলিম কার সাথে মিশবে ও সংশ্রব রাখবে এ সম্পর্কে হাদীছেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَّحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارِ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ لِيِّنٍ سَهْلٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদের এ বিষয়ে জানাব না যে, কোন্ লোক জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম অথবা কার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম? জাহান্নামের আগুন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হারাম, যে লোকদের নিকটে বা তাদের সাথে মিলেমিশে থাকে, যে কোমলমতি, নরম মেজায ও বিনম্র স্বভাববিশিষ্ট'।[২৯]

عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَ إِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً،

আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সৎ বা উত্তম সঙ্গী এবং অসৎ বা খারাপ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, মিশক আম্বর ওয়ালা ও হাপর ওয়ালার ন্যায়। মিশক আম্বর ওয়ালা তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তুমি তার কাছ থেকে কিছু ক্রয় করবে অথবা তার নিকট থেকে তুমি সুগন্ধি লাভ করবে। আর হাপর ওয়ালা তোমার বস্ত্র জ্বালিয়ে দেবে কিংবা তার নিকট থেকে তুমি দুর্গন্ধ পাবে'।[৩০]

মানুষের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে যেমন মুত্তাক্বী, পরহেযগার, সচ্চরিত্রবান লোকের সাথে মিশতে হবে, তেমনি তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে হবে। কেননা যারা মানুষের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, তার জন্য অনেক ছওয়াব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ.

---

২৭. *মুসলিম হা/৬৬০১; রিয়াযুছছালেহীন হা/৬৩৪*।

২৮. *মুসলিম হা/৬৬০২; রিয়াযুছছালেহীন হা/৬৩৫*।

২৯. *তিরমিযী হা/২৪৯০; মিশকাত হা/৫০৮৪; রিয়াযুছছালেহীন হা/৬৪২*।

৩০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, হা/৫৫৩৪, (রিয়াদঃ দারুল সালাম, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৯/১৪১৯ হিঃ), পৃঃ ৯৮৪; মিশকাত হা/৫০১০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা' অনুচ্ছেদ*।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে মুমিন ব্যক্তি মানুষের সাথে মিশে এবং তাদের প্রদত্ত কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, সে ঐ মুমিন ব্যক্তির চেয়ে অধিক নেকী লাভ করে, যে মানুষের সাথে মিশে না এবং তাদের দেয়া কষ্টেও ধৈর্যধারণ করে না'।[৩১]

মানুষের সাথে মেলামেশা সম্পর্কে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,

اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين.

'জেনে রাখ, জনসাধারণের উপরোল্লিখিত (সভা-সমিতি, উত্তম বৈঠক, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে) বৈঠক ও অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ, মেলামেশা ও উঠাবসা করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও অন্যান্য সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ), খুলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযাম প্রত্যেকের এই নীতি ও আদর্শ ছিল। পরবর্তীকালের ওলামায়ে কেরাম ও উম্মতের উৎকৃষ্ট মনীষীগণও একই আদর্শের অনুসরণ করেছেন। ইমাম শাফেঈ ও আহমাদ (রহঃ) সহ ফিক্বহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমামগণ ও অপরাপর ইসলামী চিন্তাবিদ সকলেই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করা এবং সামাজিক ও সাংসারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকেই ইসলামী যিন্দেগীর সফলতার পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করেছেন'।[৩২]

[চলবে]

৩১. *আলবানী, ছহীহ সুনান ইবনে মাজাহ, (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭/১৪১৭ হিঃ), হা/৪১০৪, ৩২৭২।*

৩২. *রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ২২৬।*

Contents

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যু

মূলঃ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী

*অনুবাদ ও তাহক্বীক্বঃ আখতারুল আমান**

বিদায়ের পূর্বাভাষঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দা'ওয়াতী জীবন পূর্ণ হয়ে গেলে পৃথিবী থেকে বিদায়ের নিদর্শন সমূহ তাঁর কাছে প্রতিভাত হ'তে লাগল। তিনি তা অনুভবও করতে লাগলেন। দশম হিজরী সনের রামাযান মাসে তিনি বিশ দিন ই'তেকাফ করলেন। অথচ এর পূর্বে তিনি মাত্র দশদিন ই'তেকাফ করতেন। জিবরীল (আঃ) তাঁকে সাথে নিয়ে (রামাযানে) কুরআন দুই বার অধ্যয়ন করেন।[১] বিদায় হজ্জের দিন তিনি বলেন, 'তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের হজ্জের নিয়মাবলী শিখে নাও। কারণ আমি হয়তো পরবর্তী বছর এই স্থানে আর তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারব না'।[২] ১১ হিজরীর সফর মাসের শেষের দিকে নবী করীম (ছাঃ) ওহোদ প্রান্তরে গেলেন এবং জীবিতরা যেভাবে মৃতদের শেষ বিদায় জানায়, সেভাবে শহীদদের ছালাতে জানাযা আদায় করলেন (বা তাদের জন্য দো'আ করলেন)। কোন এক রাতের মধ্যভাগে তিনি বাক্বী' গোরস্থানে গিয়ে মৃতদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, 'হে কবরবাসী! তোমাদের প্রতি সালাম'। তাদেরকে শুভ সংবাদ দিলেন, 'নিশ্চয়ই অচিরেই আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব'।

অসুখের সূচনাঃ

১১ হিজরীর ২৯ সফর সোমবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বাক্বী' গোরস্থানে একটি জানাযায় শরীক হন। ফেরার পথে তাঁর মাথা ব্যথা শুরু হয়, তাপমাত্রা চরমে উঠে, এমনকি মাথার পটির উপর দিয়েও তা অনুভূত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুখ বেশী হয়ে গেল। তিনি স্বীয় স্ত্রীদের জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, আগামী দিন আমি কোথায়? আগামী দিন আমি কোথায়? তারা তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। তাই তারা তাঁকে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী থাকার অনুমতি দিলেন। তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে স্থানান্তরিত হ'লেন। আয়েশা (রাঃ) মুআওবেযাত (সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস) ও নবী করীম (ছাঃ) থেকে মুখস্থ করা দো'আগুলো পড়ে পড়ে তাঁর শরীরে ফুঁক দিলেন এবং (বরকত লাভের আশায়) রাসূল (ছাঃ)-এর পবিত্র হাতকেই তাঁর দেহে ফিরালেন।[৩]

মৃত্যুর পূর্বে অছিয়তঃ

মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে নবী করীম (ছাঃ)-এর শরীরের তাপমাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। নবীপত্নীগণ তাঁকে পানির পাত্রের নিকট বসালেন এবং শরীরে পানি ঢালতে লাগলেন। এক সময় তিনি বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে'। সে সময় তিনি নিজেকে সুস্থ মনে করায় মসজিদে প্রবেশ করতঃ মেম্বারে বসলেন। তখন তিনি মাথায় পটি বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। চার পাশের উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ–

'আল্লাহ্র অভিসম্পাত ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি। তারা তাদের নবীদের (আঃ) কবর সমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে'।[৪] তিনি আরো বললেন, اَللَّهُمَّ لاَتَجْعَلْ قَبْرِى وَثَنًا يُّعْبَدُ 'হে আল্লাহ! আপনি আমার কবরকে পূজার স্থানে পরিণত করবেন না'।[৫] অতঃপর তিনি মিম্বার হ'তে নেমে যোহরের ছালাত আদায় করলেন। আবার ফিরে গিয়ে মিম্বারে বসলেন। অতঃপর আনছার ছাহাবীদের ব্যাপারে অছিয়ত করলেন। তারপর বললেন, 'আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার নয়নাভিরাম বিষয় ও তাঁর নিকট যা রয়েছে তা গ্রহণের মাঝে স্বাধীনতা দিলে তিনি আল্লাহ্র নিকট যা রয়েছে (পরকালে) তাই গ্রহণ করে নিয়েছেন'। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এতদশ্রবণে আবুবকর কেঁদে ফেললেন, আর বলতে লাগলেন, (হে রাসূল!) আপনার জন্য আমাদের পিতা-মাতা কুরবান হোক। আমরা তাঁর কান্নায় আশ্চার্যান্বিত হ'লাম। পরে জানতে পারলাম যাকে তা বেছে নেয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তিনিই হ'লেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। আবুবকর আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন। তাই তিনি বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যিনি আমাকে সঙ্গ দিয়ে ও ধন-সম্পদ দিয়ে সব থেকে বেশী ইহসান করেছেন, তিনি হ'লেন আবুবকর। আমি আমার প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কাউকে যদি খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) রূপে গ্রহণ করতাম, তবে অবশ্যই আবুবকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামিক ভ্রাতৃত্ব ও মুহাব্বত অবশ্যই রয়েছে। মসজিদ অভিমুখে কোন দরজা খোলা থাকবে না শুধুমাত্র আবুবকরের দরজা ব্যতীত'।[৬]

---

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; দাঈ, ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, আল-জাহরা শাখা, কুয়েত।*

১. *বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি।*
২. *মুসলিম, আবুদাঊদ, নাসাঈ প্রভৃতি; মুখতাছার মুসলিম, হা/৭২৪; ছহীহুল জামে' হা/৫০৬১।*
৩. *বুখারী, 'মাগাযী' অধ্যায়, হা/৪৪৩৯; মুসলিম, 'সালাম' অধ্যায়, হা/২১৯২; নাসাঈ, 'নবী (ছাঃ)-এর মৃত্যু' অধ্যায়, হা/১০; ইবনু হিব্বান, হা/৬৫৫৬; ছহীহুস সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, পৃঃ ৫৬৬।*
৪. *বুখারী ও মুসলিম, ছহীহুল জামে' হা/৫১০৮।*
৫. *মুওয়াত্ত্বা মালেক, 'কছর ছালাত' অধ্যায়, হা/৮৫; মুসনাদ আহমাদ ২/২৪৬ পৃঃ।*
৬. *বুখারী, 'মানাক্বিব' অধ্যায়, হা/৩৩৮১; মুসলিম, 'মানাক্বিব' অধ্যায়, হা/৩৬৬১।*

মৃত্যুর চার দিন পূর্বেঃ

মৃত্যুর চারদিন পূর্বে বৃহস্পতিবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেন। যথা- (১) ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ হ'তে বের করে দেয়া (২) তিনি যেভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন ঠিক ঐভাবে পরবর্তীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করা (৩) কিতাব ও সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। অথবা উসামার নেতৃত্বে সৈন্যদল প্রেরণ কিংবা তাঁর এই বাণী, ছালাত এবং তোমাদের অধীনস্ত কৃতদাসদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।[৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুখ কঠিন আকার ধারণ করা সত্ত্বেও তিনি লোকদের নিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়তে থাকেন। এমনকি মৃত্যুর চারদিন পূর্বের বৃহস্পতিবারও ছালাতে ইমামতি করেন। তিনি ঐদিন লোকদের নিয়ে মাগরিবের ছালাত আদায় করেন এবং সূরা আল-মুরসালাত পাঠ করেন। তবে এশা ছালাতের সময় অসুখ আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি মসজিদে যেতে পারেননি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি ছালাত আদায় করে নিয়েছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! না, তারা আপনার অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, 'আমার জন্য বালতিতে পানি প্রস্তুত কর'। আমরা তাই করলাম, তিনি গোসল করলেন। তারপর উঠে দাঁড়াতে গেলেন কিন্তু সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন। সংজ্ঞা ফিরে পেলে জিজ্ঞেস করলেন, লোকজন কি ছালাত আদায় করে নিয়েছে? প্রথমবারের ন্যায় দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও তিনি সংজ্ঞা হারালেন। (ছাহাবাগণও পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন)। শেষে তিনি আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট লোক মারফত নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন লোকদের ছালাতে ইমামতি করেন।[৮]

শনিবার কিংবা রোববার দিন নবী করীম (ছাঃ) নিজেকে কিছুটা সুস্থ বুঝতে পেরে দুই ব্যক্তির সাহায্যে যোহর ছালাত আদায় করার জন্য বের হন। তখন আবুবকর (রাঃ) ছালাতে ইমামতি করছিলেন। তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখতে পেয়ে পিছনে সরতে গেলে নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে ইশারায় নিষেধ করে দেন। তিনি সাথের ঐ দুই লোককে বললেন, 'আমাকে তার পাশে বসিয়ে দাও'। তারা তাঁকে আবুবকরের বাম পাশে বসিয়ে দিলেন। আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের ইক্তিদা (অনুসরণ) করলেন এবং মানুষকে তাকবীর শুনালেন।[৯]

জীবনের শেষ দিনঃ

আনাস ইবনু মালিক বর্ণনা করেন, মুসলিমগণ সোমবার দিন ফজরের ছালাতে রত ছিলেন, আবুবকর তাদের ইমামতি করছিলেন। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষের পর্দা ফাঁক করে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং মুচকি হাঁসলেন। তারা সেসময় ছালাতের কাতারে ছিল। আবুবকর পিছনের কাতারে দাঁড়ানোর জন্য পশ্চাৎ দিকে যেতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন নবী করীম (ছাঃ) ছালাতের জন্য বের হবেন। আনাস (রাঃ) বলেন, ছালাত রত মুসলিমগণ নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখে খুশীতে আহ্লাদিত হয়ে গেলে ছালাত বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয় (ছাহাবীগণ ছালাত ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করে)। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, 'তোমরা ছালাত পুরা কর'। এরপর তিনি আবার কক্ষে ঢুকে পড়লেন এবং পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন।[১০]

তারপর নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর অন্য কোন ছালাতের সময় আর আসেনি। সূর্য কিছুটা উঁচু হয়ে উঠলে তিনি ফাতিমা (রাঃ)-কে ডেকে কানে কানে কিছু কথা বললেন। এতে তিনি কেঁদে ফেলেন। আবার তাঁকে ডেকে কানে কানে কিছু কথা বললে তিনি হেসে উঠলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা তাঁকে পরবর্তীতে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে গোপনে বলেছিলেন, তিনি এখন যে ব্যথায় আক্রান্ত তাতেই তিনি ইন্তেকাল করবেন, এজন্য আমি কেঁদেছিলাম। আবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি তাঁর পরিবার থেকে সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হব, এজন্য আমি হেসেছিলাম।[১১] ফাতিমা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি মহাবিপদ মৃত্যু যন্ত্রণা আপতিত হওয়া দেখে বলেন, আহা আমার পিতা কত বড় বিপদে! নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আজকের দিনের পর তোমার পিতার উপর আর কোন বিপদ নেই।[১২] নবী করীম (ছাঃ)-এর ব্যথা বেশী হ'তে লাগল। ঐ বিষের প্রভাবও ক্রিয়াশীল হয়, যা জনৈক ইহুদী মহিলা 'খায়বারে' ভুনা ছাগলের সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল এবং তিনি তা খেয়ে ফেলেছিলেন। শেষ মুহূর্তে মানুষকে তিনি উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের অধীনস্তদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। কথাটি তিনি কয়েকবার বলেছেন'।[১৩]

মৃত্যুর পূর্বক্ষণঃ

নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসা দেখে আয়েশা (রাঃ) তাঁকে দেহে ঠেস দিয়ে ধরে রাখলেন। তিনি বলতেন, আমার উপর আল্লাহ্র অন্যতম নে'মত হ'ল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার ঘরে, আমার (পালার) দিনে

---

৭. *আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, ছহীহুল জামে' হা/৩৮৭৩।*
৮. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ১/১০২ পৃঃ।*
৯. *বুখারী হা/৬৮৩, ৭১২, ৭১৩।*
১০. *বুখারী ফাৎহ সহ ২/১৯৩ পৃঃ, হা/৬৮০, ৬৮১, ৭৫৪, ১২০৫, ৪৪৪৮।*
১১. *বুখারী ২/৬৩৮ পৃঃ।*
১২. *বুখারী ২/৬৪১ পৃঃ।*
১৩. *আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান প্রভৃতির বরাতে ছহীহুল জামে' হা/৩৮৭৩।*

আমার গলা ও বক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে মাথা রেখে ইন্তেকাল করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা আমার ও তাঁর থুথুকে একত্রিত করেছেন। তাঁর মুমূর্ষু অবস্থায় আব্দুর রহমান ইবনু আবুবকর (রাঃ) মেসওয়াক হাতে প্রবেশ করল, সে সময় আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে আমার গায়ের উপর ঠেস দিয়ে ধরে রেখেছিলাম। আমি দেখতে পেলাম তিনি তার দিকে তাকাচ্ছেন। বললাম, মেসওয়াকটি কি আপনার জন্য নিব? তিনি মাথার ইশারায় হ্যাঁ বললেন। আমি তাঁকে মেসওয়াকটি দিলাম। মেসওয়াকটি তাঁর নিকট শক্ত মনে হ'লে আমি বললাম, আমি কি ওটাকে নরম করে দিব? তিনি মাথার ইশারায় হ্যাঁ বললেন। আমি সেটা দাঁত দিয়ে নরম করে দিলাম। উহা দ্বারা তিনি স্বীয় দাঁত পরিষ্কার করলেন। অপর বর্ণনায় আছে, 'খুব সুন্দর করে তিনি মেসওয়াক করলেন'। তাঁর সামনে পানির ছোট একটি পাত্র ছিল। তিনি তাতে হাত প্রবেশ করিয়ে ভিজা হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মাসাহ করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মৃত্যুর বড়ই যন্ত্রণা।[১৪] মেসওয়াক করা শেষ করে তাঁর হাত বা অঙ্গুলী উপরে উঠালেন এবং ঘরের ছাদের দিকে তাকালেন, তাঁর ওষ্ঠদ্বয় নড়ে উঠল। আয়েশা (রাঃ) তাঁর মুখের কাছে কান পাতলেন।

সে সময় তিনি বলছিলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি যাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন তাদের তথা নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের সাথে আমাকেও শামিল করে নিন। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন এবং সুমহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দিন'।[১৫] শেষোক্ত বাক্যটি তিনি তিন বার বললেন এবং তাঁর হাত মোবারক ঝুকে পড়ল। তিনি মহান বন্ধুর সাথে মিলে গেলেন *(ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন)*।

এই দুঃখজনক সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। মদীনার চতুর্দিক যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি ঐদিনের মত উত্তম ও উজ্জ্বল আর কোন দিন দেখিনি, যেদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট শুভাগমন করেছিলেন। পক্ষান্তরে আমি ঐ দিনের মত দুঃখজনক ও অন্ধকার দিন আর পাইনি যেদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইন্তেকাল করেন।[১৬] অপর বর্ণনায় এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) যেদিন মদীনায় প্রবেশ করেন সেদিন মদীনার সমুদয় বস্তু আলোয় আলোকিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যেদিন নবী করীম (ছাঃ) চিরবিদায় গ্রহণ করেন সেদিন মদীনার সব কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়'।[১৭]

রাসূলুল্লাহ (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে ফাতিমা (আঃ) শোকাহত হয়ে বললেন, হায় আব্বাজান! যার ঠিকানা হচ্ছে জান্নাতুল ফিরদাউস। হায় আব্বাজান! আমি তো আপনার মৃত্যু শোক সংবাদ জিবরীল (আঃ)-কে শুনাচ্ছি।[১৮]

আবুবকর (রাঃ) 'সুনহ' নামক আবাসস্থল থেকে ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসলেন। ঘোড়া থেকে নামার পর মসজিদে প্রবেশ করলেন। মানুষের সাথে কোন কথা না বলেই আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে গেলেন। সে সময় তিনি 'হিবারাহ' নামক স্থানের কাপড় দ্বারা আবৃত ছিলেন। তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর চেহারা মুবারক হ'তে কাপড় সরিয়ে তাঁর উপর ঝুকে পড়লেন। তাঁকে চুম্বন করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ আপনাকে দু'বার মৃত্যু দিবেন না। আপনার উপর যে মরণ লেখা হয়েছিল তা হয়ে গেছে। এরপর আবুবকর সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ওমর (রাঃ) সে সময় মানুষের সাথে কথা বলছিলেন। আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে ওমর! আপনি বসে পড়ুন, কিন্তু ওমর বসতে অস্বীকার করলেন। তখন আবুবকর (রাঃ) কথা বলতে শুরু করলেন, মানুষ এবার ওমর (রাঃ)-কে ছেড়ে দিয়ে তাঁর দিকেই ঝুকে পড়ল। আল্লাহ্‌র প্রশংসার পর আবুবকর (রাঃ) বললেন, 'হে লোক সকল! আপনাদের মধ্য থেকে যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ইবাদত করত তাদের যেনে রাখা উচিত যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর আপনাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করত তাদের যেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী'। আল্লাহ বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّرَسُوْلٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّاللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّكِرِيْنَ–

'মুহাম্মাদ তো আল্লাহ্‌র রাসূল, তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। যদি তিনি ইন্তেকাল করেন বা নিহত হন তোমরা কি তোমাদের পশ্চাতে ফিরে যাবে? বস্তুত যে ব্যক্তি তার পশ্চাতে ফিরে যাবে সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদেরকে প্রতিদান দিবেন' *(আলে ইমরান ১৪৪)*।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, ওমর (রাঃ) বলেন, আমি যখন আবুবকরকে উক্ত আয়াতটি পাঠ করতে শুনলাম তখনই আমি অবস হয়ে গেলাম, আমার দুই পা আমাকে বহন করতে পারল না। তাঁর নিকট উক্ত আয়াত শুনে

১৪. *বুখারী ২/৬৪০ পৃঃ।*
১৫. *বুখারী ২/৬৩৮-৬৪১ পৃঃ।*
১৬. *দারেমী, মিশকাত ২/৫৪৭ পৃঃ।*
১৭. *তিরমিযী, 'মানাক্বিব' অধ্যায়, হা/৩৬২৬; শামায়েলে তিরমিযী, হা/৩৭৪; ইবনু মাজাহ, 'জানাযাহ' অধ্যায়, হা/১৬৩১; ইবনু হিব্বান মাওয়ারেদ সহ হা/২১৬২; দারেমী 'ফিল মুক্বাদ্দামাহ' ১/৪১ পৃঃ; হাকেম ৩/৫৭ পৃঃ; ইবনু সা'দ ২/২৭৪ পৃঃ; আহমাদ, ৩/১২২, ২২১, ২৪০, ২৬৮, ২৮৭ পৃঃ; শাইখ ইবরাহীম আল আলী প্রণীতঃ ছহীহুস সীরাহ আন্নাবাবিয়্যাহ, পৃঃ ৫৮৪।*
১৮. *বুখারী ২/৬৪১ পৃঃ।*

যমীনে পড়ে গেলাম এবং দৃঢ় বিশ্বাস করলাম যে, নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন।[১৯]

গোসল ও কাফন-দাফন পর্বঃ

নবী করীম (ছাঃ)-এর কাফন-দাফনের পূর্বে খেলাফত নিয়ে আলোচনা শুরু হ'ল। মুহাজির ও আনছারদের মাঝে 'ছাক্বীফায়ে বানী সাঈদাহ' নামক স্থানে এ বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হয়। পরিশেষে তাঁরা আবুবকরের খিলাফতের উপর ঐক্যমত পোষণ করেন। এসব কাজেই সোমবারের বাকী অংশ অতিবাহিত হয়ে যায়। নবী করীম (ছাঃ)-এর দেহ মুবারক 'হিবারা' নামক স্থানের কাপড়ে আবৃত অবস্থায় তাঁর বিছনায় থাকে। তাঁর পরিবার ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখে। মঙ্গলবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছাহাবীগণ তাঁর দেহ মুবারক থেকে কাপড় না খুলেই গোসল দিলেন এবং তিনটি সাদা সূতী কাপড়ে কাফন পরালেন। জামা ও পাগড়ী তাতে ছিল না। তারপর জনগণ খণ্ড খণ্ড জামা'আতে তথা ১০ জন ১০ জন করে ঐ ঘরে প্রবেশ করে তাঁর ছালাতে জানাযা আদায় করেন। নির্দিষ্টভাবে কেউ তাঁদের ইমামতি করেনি। প্রথমে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, অতঃপর মুহাজিরগণ, তারপর আনছারগণ তাঁর ছালাতে জানাযা আদায় করেন। পুরুষদের শেষে মহিলারা অতঃপর শিশু-কিশোররা তাঁর ছালাতে জানাযা আদায় করে।[২০]

নবী করীম (ছাঃ)-কে কোথায় দাফন করবেন এ নিয়ে ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে নবীই মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাঁর মৃত্যুস্থলেই দাফন করা হয়েছে'।[২১] নবী করীম (ছাঃ) যে বিছানার উপর মৃত্যুবরণ করেন, আবু তালহা তা গুটিয়ে দেন এবং তার নীচে মাটি খনন করে বুগলী ক্ববর তৈরী করেন। এটা ছিল মঙ্গলবার দিবাগত রাতের মধ্যাংশ। আলী, আব্বাস, ফযল এবং রাসূলের গোলাম ছালেহ প্রমুখ ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃতদেহ কবরস্থ করেন।[২২] আল্লাহ নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষিত করুন।

জ্ঞাতব্যঃ এ প্রবন্ধটিতে মূলতঃ নবী করীম (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের ঘটনা অবগত হওয়ার দাওয়াত পেশ করা হয়েছে। এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে তাঁর মৃত্যুকালীন ঘটনাবলী এবং মহানবী (ছাঃ)-এর মহান উপদেশাবলী। যাতে করে তা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়ে উপকারিতা লাভ করা সম্ভব হয়। যারা অতিভক্তি দেখিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুকে অস্বীকার করে বলেন, তিনি মৃত্যুবরণ করেননি, বরং পূর্বের মতই কবর শরীফে জীবিত রয়েছেন, যারা মনে করেন নবী করীম (ছাঃ) তাদের বিদ'আতী মীলাদে বা মীলাদ মাহফিলে ও মিটিং-মিছিলে হাযির হন ইত্যাদি, এসব তাদের শিরকী ধারণা। তাদের সকলের জন্য এই নিবন্ধে বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। অবশ্য বারযাখী জীবনের জীবিত থাকার কথা ভিন্ন। তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।[২৩]

এটা সান্ত্বনা স্বরূপঃ

তাদের জন্য পেশ করা হ'ল, যারা বিভিন্ন বিপদে পতিত, যাতে করে রাসূল (ছাঃ)-কে হারানো মুছীবতের কথা স্মরণ করে তাদের নিকট স্বীয় মুছীবত হাল্কা অনুমিত হয়। কারণ নবী করীম (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল হচ্ছে সবচেয়ে বড় মুছীবত। ইমাম মালিক স্বীয় মুওয়াত্ত্বায় আব্দুর রহমান বিন কাসিম হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাকে হারানোর মুছীবত যেন মুসলিমদেরকে বিভিন্ন মুছীবতে সান্ত্বনা দান করে'। ইবনু মাজাহতে আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা লোকদের (দেখার) জন্য দরজা খুললেন বা পর্দা সরালেন। দেখতে পেলেন লোকজন আবুবকর (রাঃ)-এর ইমামতিতে ছালাত আদায় করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁদেরকে এই সুন্দর অবস্থায় দেখতে পেয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং আশা করলেন, আল্লাহ যেন (ছালাতের) এই অবস্থা তাদের মাঝে স্থায়ীভাবে বিদ্যমান রাখেন। তিনি বললেন, 'হে লোক সকল! যদি কোন মানুষ বা মুমিন ব্যক্তি মুছীবতে আক্রান্ত হয়, তাহ'লে সে যেন আমাকে হারানো মুছীবত দ্বারা সান্ত্বনা লাভ করে। কারণ আমার উম্মতের কেউই আমাকে হারানোর মুছীবতের চেয়ে অন্য কোন বড় মুছীবত দ্বারা আক্রান্ত হবে না'।[২৪]

---

১৯. *বুখারী ২/৬৪০, ৬৪১ পৃঃ।*
২০. *মুওয়াত্ত্বা মালিক, 'জানাযা' অধ্যায়, ১/২৩১ পৃঃ; তাবাক্বাতু ইবনে সা'দ ২/২৮৮-২৯২ পৃঃ।*
২১. *ইবনু মাজাহ, 'জানাযা' অধ্যায়, হা/১৫৯৯।*
২২. *হাকেম ১/৩৬২ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪/৫৩; পৃঃ; প্রভৃতি; সনদ ছহীহ, ছহীহুস সীরাহ আন্নাবাবিয়্যাহ, পৃঃ ৫৮২।*
২৩. *ছহীহুল জামে' হা/২৭৯০।*
২৪. *ইবনু মাজাহ, 'জানাযা' অধ্যায়, হা/১৫৯৯, হাদীছ ছহীহ।*

Contents

মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি সমস্যাঃ প্রতিরোধে করণীয় ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

*মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন**

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

কুরআন ও হাদীছে মদ বা মাদক বুঝাবার জন্য خمـر (খামর) শব্দ এসেছে। خمـر (খামর) অর্থ ঢেকে রাখা, আচ্ছন্ন করা, গোপন করা, আবৃত করা, ঢেকে দেওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় 'খমর' হচ্ছে مَاخَمَرَ الْعَقْلَ 'যে বস্তু মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে দেয়'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) خمر (খামর)-এর সংজ্ঞায় বলেন, وَالْخَمْرُ مَا خَمَرَ الْعَقْلُ অর্থাৎ 'খামর হ'ল যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে লোপ করে দেয়'।[১] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ অর্থাৎ 'প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই খামর, আর প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই হারাম'।[২] কেউ কেউ বলেন, শরী'আতের পরিভাষায় النبيذ من مـاء العنـب اذا اشتدو غلا وقذف بالزبـد 'আঙ্গুরের কাঁচা রস আগুনে জ্বাল দিয়ে ফুটানোর পর তাতে ফেনা সৃষ্টি হ'লে তাকে খামর বলে'।[৩] যা পান করলে জ্ঞান-বুদ্ধি আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। বুখারীর একটি হাদীছ থেকে জানা যায়, তৎকালীন আরবে পাঁচ প্রকার বস্তু দিয়ে মদ তৈরী করা হ'ত। এগুলো হচ্ছে আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব ও মধু। ইসলামে সর্বপ্রকার নেশাজাতীয় বস্তুই হারাম, এগুলোর নাম যাই হোক।

৪. মদ হারাম হওয়ার ইতিবৃত্তঃ মদ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে চারটি আয়াত নাযিল হয়েছে। এ সম্পর্কে নাযিলকৃত প্রথম আয়াতে মদের বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত ছিল। আয়াতটি মক্কা মুকাররমায় অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ-

'আর খেজুর বৃক্ষের ফল ও আঙ্গুর হ'তে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য সংগ্রহ করে থাক, তবে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন' *(নাহল ৬৭)*।

তখন মদ অবৈধ ছিল না বিধায় মুসলমানদের অনেকেই সে সময় মদ পান করতেন। পরবর্তী সময়ে ওমর (রাঃ), মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) এবং আরো কতিপয় ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মদের ব্যাপারে আমাদেরকে ফৎওয়া দিন। এতে আক্বল নষ্ট হয় এবং মাল ধ্বংস হয়। তখন নাযিল হ'ল-

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا،

'তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং এতে মানুষের জন্য উপকারিতাও আছে। কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক' *(বাক্বারাহ ২১৯)*। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর কেউ কেউ মদ পান করা ছেড়ে দেন, আবার কেউ পূর্ববৎ মদ পানে অভ্যস্ত থাকেন। এ সময়ে একবার আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ) কতিপয় ছাহাবীকে দাওয়াত করেন। তারা খানা খাওয়ার পর মদ পান করেন এবং কিছু সময়ের জন্য জ্ঞানহীন হয়ে পড়েন। এ সময় তাদের কোন একজন সূরা কাফিরুন পড়তে গিয়ে لا অক্ষরটি বাদ দিয়ে পাঠ করে ফেলেন, قل يايها الكافرون اعبـد مـا تعبـدون তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَاَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَاتَقُوْلُوْنَ،

'হে মুমিনগণ! মদ্যপানোন্মত্ত অবস্থায় তোমরা ছালাতের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার' *(নিসা ৪৩)*।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মদ্যপায়ী লোকদের সংখ্যা হ্রাস পায়। পরবর্তীতে ওছমান ইবনু মালিক (রাঃ) একদল আনছার ছাহাবীকে তার বাড়ীতে দাওয়াত করেন। তারা খানা খাওয়ার পর মদ পান করে সাময়িক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। এ সময় সা'দ ইবনু আবী ওয়াককাস (রাঃ) একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। এতে তিনি আনছারদের দোষারোপ করে নিজেদের খুব গুণগান বর্ণনা করেন। এ কবিতা শুনে এক আনছার যুবক রাগান্বিত হয়ে উটের গণ্ড দেশের একটি হাড় সা'দ (রাঃ)-এর মাথায় ছুড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত আনছার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করলেন اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شـافيا 'হে আল্লাহ! মদ সম্পর্কে আমাদেরকে একটি পরিস্কার বিধান বলে দিন'।[৪] তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন-

১. *ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৮৫।*
২. *ছহীহ মুসলিম, হা/২০০৩।*
৩. *অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত মাস'আলা-মাসায়েল, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬), পৃঃ ৩৬।*
৪. *আবুদাঊদ হা/৩৬৭০; তিরমিযী হা/৩০৪৯।*

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ-

'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর সমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ। সুতরাং তোমরা যেন তোমরা সফলকাম হ'তে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও ছালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না? *(মায়েদাহ ৯০-৯১)*।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন ঘোষককে তা প্রচারের জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি মদীনার অলি-গলি ঘুরে এ কথা ঘোষণা করলেন এবং এ হুকুম সর্বত্র পৌঁছে দিলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি আবু তালহা (রাঃ)-এর ঘরে লোকদেরকে মদ পরিবেশন করছিলাম। তখনই মদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন ঘোষককে তা প্রচারের নির্দেশ দেন। ঐ ব্যক্তি এ মর্মে ঘোষণা দিচ্ছিল যে, মদ হারাম করা হয়েছে। তখন আবু তালহা (রাঃ) আমাকে বললেন, বেরিয়ে দেখ তো কিসের ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে? আনাস (রাঃ) বলেন, আমি বেরুলাম এবং এসে বললাম, একজন ঘোষক ঘোষণা দিচ্ছেন যে, জেনে রাখ, মদ হারাম করা হয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বললেন, যাও এগুলো সব ঢেলে দাও। আনাস (রাঃ) বলেন, সেদিন মদীনা মুনাওয়ারার রাস্তায় রাস্তায় মদের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল।[৫]

মাদকদ্রব্যের অপকারিতাঃ

মদ ও মদ জাতীয় দ্রব্য সেবনের মধ্যে বহু অপকারিতা নিহিত আছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য অপকারিতাগুলো আলোচনা করা হ'ল-

(১) মদ্যপায়ী ব্যক্তি যখন মদ পান করে তখন তার থেকে ঈমানের নূর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَايَزْنِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَشْرِبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ-

'নবী (ছাঃ) বলেন, ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময়, মদ্যপ মদপান করার সময় ঈমানদার অবস্থায় থাকে না। এমনিভাবে চোর চুরি করার সময় ঈমানদার অবস্থায় থাকে না'।[৬]

(২) মদ পানকারী ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَلشَارِبَها وَسَاقِيْهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَعِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُوْلَةِ إِلَيْهِ-

'আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন ১. মদের প্রতি ২. মদ্যপায়ীর প্রতি ৩. মদ পরিবেশনকারীর প্রতি ৪. মদ ক্রয়কারীর প্রতি ৫. বিক্রয়কারীর প্রতি ৬. প্রস্তুতকারীর প্রতি ৭. যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তার প্রতি ৮. বহনকারীর প্রতি এবং ৯. যার জন্য মদ বহন করে আনা হয় তার প্রতি।[৭]

(৩) মদ্য পানের কারণে দুঃশ্চিন্তা, রিযকের সংকীর্ণতা, চেহারা বিকৃতি এবং ভূমিকম্প ও ভূমি ধসে যাওয়া ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে। হাদীছে এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

ليكونن فى هذه الامة حسف وقذف ومسنم وذالك إذأشربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا معازف-

'এ উম্মত যখন মদপান করবে, গায়িকাদের দ্বারা গান করাবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে তখন তাদের মধ্যে ভূমিকম্প, প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং আকৃতি বিকৃত হওয়া সংঘটিত হবে'।[৮]

(৪) মদ পানের কারণে মদ্যপায়ী ব্যক্তির সর্বপ্রকার গুণাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কেননা মদ হচ্ছে সমস্ত গুণাহের উৎস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إجتنبوا الخمر فانه مفتاح كل شر، 'তোমরা সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য পরিহার করবে। কেননা তা হচ্ছে সমস্ত পাপের চাবিকাঠি'।[৯]

(৫) মদ্য পানের কারণে যেসব রোগ-ব্যধি সৃষ্টি হয় তা বংশ পরম্পরায় চলতে পারে।[১০]

ফ্রান্সের জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরী তার বিখ্যাত 'খাওয়াতির সাওয়ানিহ ফিল ইসলাম' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানদের খতম করার জন্য এ মদ ছিল অব্যর্থ তলোয়ার।[১১]

---

৫. *বুখারী, হা/৫৫৮২, ৪৬১৭।*

৬. *বুখারী হা/৫৫৭৮; মিশকাত 'ঈমান' অধ্যায়, হা/৫৩।*
৭. *আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৭৭৭।*
৮. *কানযুল উম্মাল, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৩৭৮।*
৯. *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৩৬৮।*
১০. *আল-ফিক্বহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ৫ম খণ্ড।*
১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১-৪৩।

হাদীছের আলোকে মদ ও মাদকের বিধানঃ

মহানবী (ছাঃ)-এর বহুমাত্রিক শিক্ষার অন্যতম বড় অবদান হচ্ছে মদ ও মাদকাসক্তির ভয়াবহ অভিশাপ থেকে তিনি মানব জাতিকে মুক্তি দিয়েছেন। বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর মাদক বিরোধী এ শিক্ষা সপ্তম শতাব্দীর এমন এক সন্ধিক্ষণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে, যখন গোটা দুনিয়ার বিভিন্ন সমাজ নেশার জগতে হাবুডুবু খাচ্ছিল; সাদা পানি পান করা তখন দোষের বিষয় ছিল। ইরানী জনগণ শরাবের পেয়ালাকে সমীহ করত প্রাচীন পারস্য সম্রাট জামশেদের পানপাত্র মনে করে; ভারতে দেবতা ও ঠাকুরের সান্নিধ্য অর্জনের জন্য মদের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত যরূরী। দ্বীন ও দুনিয়ার অনেক রীতি-প্রথা তখন মদের ব্যবহার ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকত। আরবের অনেক কবির কাব্য ভাণ্ডার মদ ও মাদকের প্রশংসায় ছিল পূর্ণ। আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর মতে, মদ নিজে পান করা ও অপরকে পান করানো ছিল সে যুগের অভিজাত ব্যক্তিবর্গের বিলাসিতার অন্যতম মাধ্যম। স্বামী-স্ত্রীকে ও ছোটরা বড়দেরকে নিজ হাতে মদ পান করাতো। ঠিক এমন এক নাযুক মুহূর্তে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের মুকাবিলায় মহানবী (ছাঃ) মদ পরিহারের ঘোষণা দিয়ে বলেন, মাদক হচ্ছে সব অপরাধের প্রশূতি বা 'উম্মুল খাবায়িছ'। ফিতনা-ফাসাদের অগ্নি শিখাকে প্রজ্জ্বলিত করে দেয় মাদকতা; মাদকাসক্ত মানুষ ভাল-মন্দ পার্থক্য করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। মাদক মানুষকে অন্ধ করে দেয়, মা-বোন-কন্যার পার্থক্য ভুলিয়ে দেয়, দৈহিক তেজ ও মানসিক ভারসাম্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। মানুষের হাত থেকে ন্যায়-ইনসাফ এবং সত্য ও সততার মীযান খসে পড়ে। যে সমাজে মাদকাসক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটে সেখানে নৈতিক ও সামাজিক অপরাধ মহামারী আকার ধারণ করে।

বিশ্বনবী (ছাঃ) সমাজে প্রজ্জ্বলিত মাদকাসক্তির জাহান্নাম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। এতে তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। তিনি অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে মদ্য পান ও মাদক সেবনের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দাওয়াতের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের মানুষের মন-মেজায নতুন করে গড়ে তোলেন। তাদের অন্তরে মাদকের ক্ষতির অনুভূতি জাগ্রত করেন। অতঃপর মাদক পরিহারের হুকুম জারি করেন। মদ ফেলে দাও এবং এর পান পাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেল। বিশ্বনবী (ছাঃ) মদ, জুয়া, কুবা, গোরায়বা প্রভৃতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এ সম্পর্কিত কতিপয় হাদীছ নিম্ন উল্লেখ করা হ'ল-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةَ-

প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দুই প্রকারের বৃক্ষ থেকে মদ তৈরী হয়, খেজুর ও আঙ্গুর'।[১২]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمَ الْخَمْرِ وَهِىَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ اَلْعِنَبُ وَالتَّمَرُ وَ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيْرُ وَالْعَسَلُ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلُ-

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একদা ওমর (রাঃ) (মসজিদে নববীতে) রাসূলের মিম্বরের উপর (দাঁড়িয়ে) ভাষণ দান কালে বলেন, নিশ্চয়ই মদ হারাম ঘোষণা করে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর তা সাধারণত পাঁচ প্রকারের খাদ্যদ্রব্য থেকে প্রস্তুত হয় আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব ও মধু। আর মদ বা মাদক হচ্ছে তা, যা বুদ্ধিকে লোপ করে দেয়'।[১৩]

عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام،

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে বস্তু অধিক পরিমাণে সেবন করলে নেশা সৃষ্টি করে, তার কিঞ্চিৎ পরিমাণও হারাম'।[১৪]

عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم ضرب فى الخمر بالجريد والنعال وجلد ابو بكر أربعين-

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদ পানের জন্য খেজুর গাছের ডাল ও জুতা দ্বারা প্রহার করেছেন এবং আবু বকর (রাঃ) চল্লিশ ঘা মেরেছেন।[১৫]

عن السائب ابن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرة أبى بكر وصدر من خلافة عمر فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وارديتنا حتى حان اخر امرة عمر فجلد اربعين حتى اذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين-

---

১২. *মুসলিম, হা/১৯৮৫।*
১৩. *বুখারী, হা/৫৫৮১।*
১৪. *তিরমিযী হা/১৮৬৫; আবুদাঊদ, হা/৩৬৮১; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯৩।*
১৫. *বুখারী হা/৬৭৭৩; মুসলিম হা/১৭৫৬।*

Contents

সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে আবুবকরের খেলাফত কালে এবং ওমরের খেলাফতের প্রারম্ভে মদ্যপায়ীকে এনে উপস্থিত করা হ'ত। তখন আমরা আমাদের হাত, জুতা এবং চাদর দ্বারা তাকে আঘাত করতাম। কিন্তু ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের শেষ দিকে তিনি চল্লিশ চাবুক মারতেন। আর যখন তারা (মদ্যপায়ীরা) সীমালংঘন করতে লাগল এবং ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হ'তে আরম্ভ করল, তখন তিনি আশি দোররা মারতে লাগলেন।[১৬]

মাদক পরিহারকারীদের জন্য পরকালীন সুসংবাদঃ

যারা দুনিয়ায় মদ ও মাদকদ্রব্য সেবন থেকে নিজেদের বিরত রাখবে আল্লাহপাক পরকালীন জীবনে জান্নাতে তাদেরকে এক ব্যতিক্রমধর্মী পানীয় সরবরাহ করবেন, যার তুলনা পৃথিবীতে নেই। আর যারা দুনিয়ায় মাদক সেবন করবে, জান্নাতের এ নে'মত থেকে তারা বঞ্চিত হবে। জান্নাতের পানীয় ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তার বর্ণ হবে নির্মল, স্বচ্ছ, তা স্বাদে হবে অতি সুস্বাদু। তার মধ্যে এমন কোন ক্রিয়া থাকবে না যদ্দরুন মস্তিষ্কে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মাথায় চক্র বা মাতলামির ক্রিয়া তাতে মোটেই থাকবে না'।

মহানবী (ছাঃ)-এর শিক্ষার প্রভাবঃ

মহানবী (ছাঃ) প্রদত্ত মাদক বিরোধী শিক্ষার ফলে তৎকালীন সমাজে মাদক সেবন শূন্যের কোটায় নেমে আসে। তাঁর শিক্ষা পেয়ে ছাহাবীগণও হয়েছিলেন মাদক সেবনের কঠোর বিরোধী। ফলে মাদক উৎপাদন, বিপনন, পরিবহন, সেবন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। শুধু আরব দেশে নয়, বর্হিবিশ্বেও মহানবী (ছাঃ)-এর শিক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইংল্যাণ্ড ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ নিজে মদ পান পরিত্যাগ করেন এবং মদ পানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে মাদক উৎপাদনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ শুরু হয়েছে। আজ থেকে ১৫শ' বছর আগে মহানবী (ছাঃ) মাদক বিরোধী যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার সুদূর প্রসারী প্রভাব দুনিয়ার সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে।[১৭]

মাদক প্রতিরোধে করণীয়ঃ কতিপয় প্রস্তাবনা

সর্বনাশা মাদকাসক্তি বর্তমান বিশ্বসভ্যতার জন্য হুমকি স্বরূপ। বর্তমানে মাদকদ্রব্যের অত্যাধুনিক সংস্করণ মারিজুয়ানা, আফিম, কোকেন, এ্যালকোহল, ক্যানিবিস, মদ, ডিডোব্রিন, হেরোইন প্রভৃতি মাদকদ্রব্য নৈতিকতা বিধ্বংসী কাজে কামানের ন্যায় কাজ করছে। ফলে দিনের পর দিন হত্যা ও ধর্ষণ সহ নানাবিধ অসামাজিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের প্রায় ৫০ কোটি মানুষ মাদকের শিকার।[১৮]

এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিবছর বিশ্বের প্রায় ১০,০০০ (দশ হাযার) লোকের মৃত্যু হয় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণের ফলে। মাদকদ্রব্য পাচারকারী ও আসক্তদের হাতে গত কয়েক বছর আগে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সিনেটর লুইস কার্লোস গ্যালেন। তার আগে নিহত হন আরেক বিচারপতি।[১৯] হত-দরিদ্র আমাদের এই বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য সেবীর সংখ্যা ২ লক্ষাধিক। আর এ ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে অভিজাত মহলের অনেক লোক। ইনজেকশন জাতীয় মাদকদ্রব্যের সুবাদে অনেক কোটিপতিও প্যাথেড্রিন ইনজেকশন নিয়ে নেশা করছে। যুবসমাজ মাদক সেবন করে হচ্ছে নারী আসক্ত। খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, রাহাজানি, ছিনতাই ও সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ এই মাদকাসক্তি। এর ফলে যেমন দুরারোগ্য ব্যাধির প্রসার ঘটছে তেমনি নৈতিক গুণাবলীও হ্রাস পাচ্ছে। মাদকদ্রব্য বা মাদকাসক্তি তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ, নৈতিক স্খলন, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অপরাধ প্রবণতার জন্ম দিচ্ছে তা সমাজ জীবনের গতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। এর বিরুদ্ধে কার্যকর সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা অপরিহার্য। মাদকদ্রব্যের সর্বগ্রাসী আক্রমণ থেকে মানব সমাজকে মুক্ত করে একটি কল্যাণকর ও গতিশীল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের সরকার, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং আগ্রহী গোষ্ঠীর সামনে আশু করণীয় কয়েকটি প্রস্তাবনা তুলে ধরা হ'ল।

(১) দেশের সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শ্রমজীবী ও পেশাজীবীর সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করে দেশে স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সম্প্রদায়কে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তকরণের ব্যবস্থা করে তাদের হতাশা ও নৈরাশ্য দূর করা।

(২) স্ব-স্ব ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতঃ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সকল প্রকার দলীয় রাজনীতি বন্ধকরণের মাধ্যমে ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ব্যবস্থাকরণ। শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সহ ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে প্রতিহিংসামূলক স্বার্থান্ধ রাজনীতি ও অস্ত্রের বদলে কলম ও বইকে তথা শিক্ষাকে বেশী প্রাধান্য দেয় সে পরিবেশ সৃষ্টি করা।

---

১৬. *বুখারী হা/৬৭৮০।*
১৭. *স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ইসলাম, পৃঃ ২০১-২০২।*
১৮. *সৈয়দ শওকতুজ্জামান, বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যাঃ স্বরূপ ও সমাধান, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খৃঃ), পৃঃ ২৬৬।*
১৯. *আবদুদ্দাইন মুহাম্মাদ ইউনুস, সমাজ গঠনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি; (ঢাকাঃ মুক্তমন প্রকাশন, ১৯৯৮), পৃঃ ১৯।*

(৩) মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে যুব ও কিশোরদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে তথা স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রমে মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংযুক্ত করা। যাতে তরুণ-তরুণী ও যুবসমাজের মধ্যে মাদক সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়।

(৪) মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ। এজন্য বিভিন্ন প্রচার ও যোগাযোগ মাধ্যম যেমন- রেডিও, টিভি, সিনেমা, সংবাদ পত্র, সাপ্তাহিক ও মাসিক ম্যাগাজিন, লিফলেট, বুকলেট, আলোচনা সভা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।

(৫) 'ইসলামে মদ হারাম' এই চরম সত্য ও কল্যাণকর উক্তি বাস্তবায়িত করার জন্য সকল শ্রেণীর মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করার ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে মসজিদের ইমাম ও আলেম সমাজ জুম'আর খুৎবা, দুই ঈদের খুৎবা ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বক্তব্যের মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।

(৬) বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য চোরাচালান ও ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তি দানের ব্যবস্থা গ্রহণ। এজন্য সংশ্লিষ্ট আইনের যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে প্রণীত আইনের যথাযথ প্রয়োগ ছাড়া এ প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব নয়।

(৭) সকল প্রকার মাদকদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ও উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা।

(৮) মাদক চোরাচালানের সকল রুট বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৯) লাইসেন্সবিহীন ঔষধের দোকান বন্ধ এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নেশা উৎপাদনকারী ঔষধ বিক্রির উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা।

(১০) আমাদের দেশে বসবাসকারী এবং অনুপ্রবেশকারী মাদকাসক্তদের প্রতি কড়াকড়ি নযর রাখা, যাতে তারা এদেশের কাউকে মাদকাসক্ত করতে না পারে। সাথে সাথে মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দেয়া উপদেশাবলী দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগান।

(১১) সারা দেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর ও সিপাই মিলে ৮৫০ জন লোকবল থাকা সত্ত্বেও অবৈধ মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। সিআইডি (Criminal Investigation Department) পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী পুরো দেশে দুই লাখ ট্রাক ড্রাইভার মাদক সেবনে অভ্যস্ত। তারা বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে নিত্য দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে। প্রতি ১০টি দুর্ঘটনার মধ্যে ৬টি হচ্ছে উচ্চ মাত্রায় মাদক সেবনের ফল। এভাবে মাদকাসক্ত ড্রাইভাররা অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে নিয়মিত।[২০] অতএব ড্রাইভারদের ড্রাইভিং লাইসেন্সে এ শর্তারোপ করা যে, কোন ড্রাইভার যদি মাদকদ্রব্য সেবন করে আর সেটা শনাক্ত হয় তাহ'লে তার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল সহ মাদকদ্রব্য আইন অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করবে।

পরিশেষে বলতে পারি যে, মহানবী (ছাঃ)-এর আনিত অহি-র বিধানের শিক্ষাই মাদকের সর্বনাশা অভিশাপ থেকে আমাদের সমাজকে, আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারে। অতএব যে কোন মূল্যে মাদকতাকে উৎখাত করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যত প্রজন্ম পঙ্গু হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নজরুল ইসলামের একটি মন্তব্য উল্লেখ করে শেষ করছি, "It is a major threat to us that more than on third of the educated people are taking drugs which can cripple the nation. 'এটা আমাদের জন্য বিরাট হুমকি যে, শিক্ষিতদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মাদক সেবন করছে। যা জাতিকে পঙ্গু বানিয়ে দিতে পারে'।[২১]

---

২০. *স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ইসলাম*, পৃঃ ২০২-২০৩।
২১. *তদেব*।

সেকুলারিজম ধর্মের যম

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের প্রায় আড়াই হাযার বছর পূর্বে ভারতের কপিলাবস্তু রাজ্যের (বর্তমান নেপাল) রাজা শুদ্ধোধনের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম সিদ্ধার্থ। তিনি শৈশব থেকেই যাবতীয় লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে ছিলেন। সেকালে ভারতীয় বৈদিকেরা পশু হত্যা করে যজ্ঞ করতো। এটা ছিল তাদের ধর্মের বিধান। বয়ক্রম কালে সিদ্ধার্থ বলতেন, 'জীব হত্যা মহাপাপ'। বার্ধক্য এবং মৃত্যু তাকে আরও ভাবিয়ে তোলে। যৌবনে তিনি নির্জনে ধ্যান করতেন। ধ্যানে তিনি কি পেয়েছিলেন, তা তিনিই জানতেন। তিনি বলতে শুরু করেন, 'অহিংসা পরম ধর্ম' এটা ইসলামও সমর্থন করে। তিনি ঈশ্বর, আল্লাহ, গড এসব বিষয়ে কিছু বলতেন না। তিনি বলতেন, লোভ-লালসা ও হিংসা দুঃখের কারণ। মানুষের জন্মও দুঃখের কারণ। তিনি এসব থেকে পরিত্রাণের জন্য সংসারবিরাগী হয়ে শুধু ধ্যানে মশগূল থাকতেন। সেকালে তার কতিপয় অনুসারী শিষ্য জুটে গিয়েছিল। কালক্রমে তারা তার নাম দিলেন 'বুদ্ধ' (জ্ঞানী)। স্রষ্টার প্রসঙ্গে তিনি কিছুই বলতেন না। তাই কালক্রমে তার মতবাদের অনুসারীরা তাকে বলতেন, তিনি ঈশ্বরাবতার। দার্শনিকেরা বলতেন, Nihilist (শূন্যবাদী)। বহুপরে অনুসারীরা তার মতবাদকে নাম দিলেন 'বৌদ্ধধর্ম'। আর তাকে বলতেন, ভগবান তথাগত বুদ্ধদেব। কবি জয়দেব লিখলেন তার বন্দনা-

'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর জয়জগদীশ হরে'

বৈদিক ধর্মের যজ্ঞ বিধির বিরুদ্ধবাদী বুদ্ধ দেবকে অনেকের অসহ্য মনে হওয়ায় তার মতবাদ ভারতে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। বৌদ্ধ ধর্ম তাই মাইগ্রেট করলো ভারতের বাইরে চীনে, জাপানে, সিংহলে, ফিলিপাইনে। বৌদ্ধরা ঠিক-বেঠিক যাই করুক, তারা 'সেকুলার' ছিল না। অবশ্য মাওসেতুং-এর কল্যাণে চীনে 'সেকুলারিজম' ঢুকে পড়েছে।

আল্লাহ তা'আলা মানব সহ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি প্রথমে হযরত আদম (আঃ) এবং মা হাওয়াকে সৃষ্টি করে বেহেশতে রাখেন। অতঃপর তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠান। দুনিয়াতে পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন, وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ، 'আমি মানব ও জিন জাতিকে কেবল মাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*। ইবাদত কিরূপে করতে হবে সেজন্য আল্লাহ Code of life নাযিল করেছেন। যার নাম আসমানী কিতাব। আর তা বুঝবার এবং বুঝাবার জন্য তিনি যুগে যুগে মানুষের মধ্য থেকেই নবী-রাসূল মনোনীত করেছেন। তাদের উপর পৃথক পৃথক আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর পূর্ণাঙ্গ আসমানী কিতাব 'আল-কুরআন' নাযিল হয়েছে। এটি সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। এই কিতাব সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেছেন, ذَالِكَ الْكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيْـهِ 'এটি এমন কিতাব, যাতে কোন সংশয়-সন্দেহ নেই' *(বাক্বারাহ ২)*।

প্লেটো, এরিস্টটল, সক্রেটিস, কার্লমার্কস, এঙ্গেলস, চার্লস ডারউইন, আইনেস্টাইন, লেনিন, মাওসেতুংসহ বিভিন্ন শূন্যবাদী, নাস্তিক দার্শনিক, বস্তুবাদী বিজ্ঞানীদের মতবাদ কশ্মিনকালেও অভ্রান্ত নয়। একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত ঐশী বিধানই অভ্রান্ত। আল্লাহ বলেন, اِتَّبِعُـوْا مَـا أَنْـزَلَ اللهُ 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার অনুসরণ কর' *(বাক্বারাহ ১৭০)*। তিনি আরও বলেন, خُذُوا مَا اٰتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ، 'তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা শক্ত করে ধারণ কর এবং তাতে যা আছে, তা স্মরণ কর' *(বাক্বারাহ ৬৩)*।

আল্লাহ আরও বলেন, كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُـوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُـوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُـمْ مَـا لَـمْ تَكُوْنُـوا تَعْلَمُـوْنَ، 'আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনান, তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। আর তোমাদেরকে এমন সব জিনিস শিক্ষা দেন, যা তোমরা পূর্বে জানতে না' *(বাক্বারাহ ১৫১)*। সুতরাং এরপর দুনিয়ায় এমন আর কোন্ দার্শনিক, সংস্কারক, রাজনৈতিক, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানী রয়েছে, যার কথা মানুষকে শুনতেই হবে?

হযরত ঈসা (আঃ)-কে খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরপুত্র বলে। তারা তাঁর নাম দিয়েছে 'যীশুখ্রীষ্ট'। তাঁর বক্তব্য এ রকম "I am the apostle of god sent unto you, confirming the law which was delivered before me and bringing good tidings of an apostle that shall come after me whose name shall be Ahmed (Mohammad)".

ইঞ্জীলেও (বাইবেল) তাঁর উল্লেখ রয়েছে। খ্রীষ্টানরা যিশুকে আল্লাহ্র পুত্র এবং একমাত্র ত্রাণকর্তা বলে মনে করে। তাঁকে আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ বলেন, قُلْ هُوَاللهُ اَحَدٌ، اَللهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُـنْ لَّـهُ كُفُوًا اَحَـدٌ– 'আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ একক অদ্বিতীয়, তিনি মুখাপেক্ষীহীন, তিনি জনকও নন, জাতও নন এবং তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই' *(ইখলাছ ১-৩)*।

আল্লাহ্র অস্তিত্ব সকল ধর্মে স্বীকৃত। আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস না থাকা অধর্মের লক্ষণ। বলা হয়েছে Belief in god

* সম্পাদক, কালান্তর, রাজবাড়ী, পিরোজপুর।

(Allah) is the ultimate confession of all the faiths of the world.

অতএব আল্লাহ্‌র নির্দেশের বাইরে যারা উল্টা-পাল্টা কিছু করে তারা যে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৬২২ ঈসায়ীতে মহানবী (ছাঃ) জন্মভূমি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। তখনও আরবের লোকেরা ধর্মের প্রতি আস্থাশীল ছিল। তারা আল্লাহকেও মানত। তবে মূর্তি পুজা করত। ৩৬০টি মূর্তি ছিল কা'বা গৃহে। তারা সেগুলিকে দেবতা মনে করত। সেগুলির মধ্যে কারো ক্ষমতা বেশী, কারো ক্ষমতা কম- এটাই তাদের ছিল ধারণা। মহানবী (ছাঃ) নবুঅত পেয়ে ঘোষণা করলেন, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই'। তাঁর এ কথায় মক্কার লোকেরা তাঁর উপর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠলো। ফলে আল্লাহ্‌র নির্দেশে তিনি হিজরত করে মদীনায় যেতে বাধ্য হন। তিনি স্বীয় অনুসারীদের নিয়ে মদীনায় ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষ সঠিক ধর্মমতের, ধর্মপথের সন্ধান লাভে ধন্য হ'ল। অতঃপর আল্লাহ্‌র দ্বীন পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। যারা এ দ্বীনের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিলেন ইহকালে ও পরকালে তাদের শান্তির ফায়ছালা হ'ল। তলোয়ারে নয়, ইসলামের উদারতা ও ইনসাফে সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে সুখ-শান্তি ফিরে আসল। মানব চরিত্র উন্নত হ'ল, সমাজ থেকে দুর্নীতি ও পাপাচার দূর হয়ে গেল।

আজ চৌদ্দশত বছর পরে এসে সুখ- শান্তি আর সমৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রে ও সমাজে 'সেকুলারিজম' কেন আবশ্যক? সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষের মধ্যে নৈতিকতার বিকাশ ঘটায়, না পশুত্বের বিকাশ ঘটায়? পশুর কোন ধর্ম নেই। কিন্তু মানুষের জন্য ধর্ম আছে। তবু কেন মানুষ 'সেকুলার' হ'তে চায়? কি লাভ তাতে? মানুষ বুদ্ধিমান জীব। তাদের তো মন্দ এড়িয়ে ভালোর দিকে অগ্রসর হবার কথা। তারা কেন ভালকে বর্জন করে মন্দের দিকে ধাবিত হবে? এটা ভাববার বিষয় বৈকি!

২ নভেম্বর'০৬ তারিখে ইনকিলাবে প্রকাশিত ফিরোজ মাহমুদ কামালের লেখা 'সেকুলারিজম যেভাবে দুর্বৃত্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে' শীর্ষক রচনাটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারই অসীলায় আমার এ লেখা।

সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) শব্দটি অভিধানে বহুকাল পূর্বেই গৃহীত হয়েছে। রাশিয়ায় এবং চীনে তার প্রচার প্রসার ঘটেছে, সেও বহুকাল আগেকার ঘটনা। তাছাড়া বিশ্বের আরো কোন কোন দেশ হয়ত এ আদর্শ মেনে নিয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হ'ল বিভক্ত হয়ে। স্বাধীন ভারতের সরকার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ আদর্শটি মেনে নিয়েছে। অবশ্য সেখানে ধর্মের (যে ধর্ম তারা অনুসরণ করে) দোর্দণ্ড প্রতাপ বহালই রয়েছে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হ'লে তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে 'সেকুলারিজম' (ধর্মনিরপেক্ষতা) গ্রহণ করলেন। এটা ভারতের দেখাদেখি কি-না বলতে পারি না। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশ সরকার অধর্মকে (সেকুলারিজম) বাদ দিয়ে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ধর্মীয় করে নিলেন। কিন্তু ধর্ম অধর্মের 'টাগ অফ ওয়ার' আজও বন্ধ হ'ল না। একদল বলে ইসলাম ধর্মীয় আদর্শের কথা, অন্যদল বলে 'সেকুলারিজম' (ধর্মনিরপেক্ষতা)-এর কথা। পত্র-পত্রিকায় আলোচনা-সমালোচনা কিছুতেই থামছে না।

আমাদের বাংলাদেশে প্রথম যখন সংবিধান রচনা করা হয় তখন ধর্মনিরপেক্ষতা (Scularism) রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে সংবিধানে স্থান লাভ করে। তারপর থেকে সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের কাছে ব্যাখ্যা শুনেছি, 'ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়। এতে যে যার ধর্ম বাধাহীনভাবে পালন করার অধিকার পাবে। রাষ্ট্র কারো ধর্মের প্রতি পক্ষপাত করবে না, হস্তক্ষেপও নয়। কর্মক্ষেত্রেও সবার সমান স্বাধীনতা এবং অধিকার থাকবে'। ভেবে পাই না, এর কি প্রয়োজন ছিল? আমারতো মনে হয়, রাষ্ট্র প্রশাসনের উচিত রাষ্ট্রের সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের নাগরিকদের সকল বিষয়ের উপরে খবরদারী করা। তা-ই মঙ্গলজনক এবং শান্তি-শৃংখলার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে। রাষ্ট্রের একজন মুসলমানকে কিংবা যে কোন ধর্মের নাগরিকের ধর্মান্তরিত হবার অধিকারে সরকার হস্তক্ষেপ না করলে অন্য কোন নাগরিকের কোন লাভ-ক্ষতির কারণ ঘটে না। কিন্তু ধর্ম এবং সমাজ ব্যবস্থায় যথেচ্ছা খিচুড়ি পাকালে, যে পাকায় তার ক্ষতি হোক বা না হোক রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যান্যদের ক্ষতির আশংকা থাকলে সরকারের (রাষ্ট্রের) অবশ্যই হস্তক্ষেপ করা উচিত, যদি তা প্রকাশ্যে ঘটে। অন্যান্য ধর্মের কথা জানি না, তবে ইসলামী বিধান মতে তা গর্হিত।

কবি সুফিয়া কামাল মুসলমান। তার কন্যার নাম সুলতানা কামাল। তিনিও মুসলমান। তার স্বামীর নাম সুপ্রিয় চক্রবর্তী। ফেরদৌসী মজুমদার এখনও মুসলমান। তার স্বামী হ'ল রামেন্দু মজুমদার। অধ্যক্ষ দরবেশ আলীর মেয়ে মুসলমান। কিন্তু তার স্বামী হ'ল জুয়েল আইচ। সংগীত শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন বিয়ে করেছিলেন সুমন চট্টোপাধ্যায়কে। শহীদুল্লাহ কায়সারের মেয়ে শমী কায়সার মুসলমান। তিনি বিয়ে করেছিলেন অর্নব ব্যানার্জী (রিংগো)-কে।

এসবই ইসলাম ধর্মের চরম বরখেলাপ। যারা 'সেকুলার' শুধু তারাই এসব করতে পারে। আর সেকুলারিজমের কারণেই তারা এসব করে পার পেয়ে যায়। সরকারের আইনে বাধা না থাকলে সমাজের লোক কথা বলার সাহস পায় না। যদি বিরুদ্ধে কিছু বলে কিংবা সামাজিক বিচারের চেষ্টা করে, তবে তা ফৎওয়াবাজি নামে নিন্দিত হয়। এমনকি আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধীও বিবেচিত হ'তে পারে। এজন্য সমাজকে মুখ বুঝে থাকতে হয়। তাই বলছিলাম, সেকুলারিজম ধর্মের যম!

Contents

দো'আঃ গুরুত্ব ও ফযীলত

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

[৩য় কিস্তি]

সঠিকভাবে আল্লাহকে না ডাকার পরিণতিঃ

দো'আ হচ্ছে ইবাদত। যে কোন ইবাদত আল্লাহ্র দরবারে কবুল হওয়ার জন্য ঈমানের পরে দু'টি শর্ত থাকা যরূরী। প্রথমটি হ'ল- একনিষ্ঠতা। আর দ্বিতীয়টি হ'ল- রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ। যদি দো'আ আল্লাহ্র জন্য না হয়, আল্লাহকে ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নিকট হয় তাহ'লে সে দো'আ হবে শিরক। আল্লাহ বলেন,

وَلَاتَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَايَنْفَعُكَ وَلَايَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِيْنَ–

'তুমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না, যে তোমার কোন উপকার করতে পারবে না এবং অপকারও করতে পারবে না। যদি তুমি এমন কাজ করো তাহ'লে অবশ্যই তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(ইউনুস ১০৬)*।

এখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে দো'আকারীকে আল্লাহ যালেম বলেছেন। আর পবিত্র কুরআনে শিরককে বড় যুলুম বলে অভিহিত করা হয়েছে।

يَابُنَىَّ لَاتُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ–

'(লুকমান বলল) হে বৎস! তুমি আল্লাহ্র সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক বড় যুলুম' *(লুক্বমান ১৩)*।

দো'আর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতগুলি শিরক হ'ল-

* মৃতব্যক্তির কাছে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য দো'আ করা। যেমন সন্তান চাওয়া, রোগমুক্তি প্রার্থনা, অভাব মোচন কামনা ইত্যাদি।

* আল্লাহ্র কাছে দো'আ করার ক্ষেত্রে মৃতব্যক্তিকে অসীলা বা মাধ্যম করা। যেমন বলাঃ হে আল্লাহ! আমাকে অমুক পীরের অসীলায় মুক্তি দাও।

দো'আর আরেকটি অবস্থা হ'ল বিদ'আত। দো'আ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হ'লেও যদি তা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী না হয়, তাহ'লে সে দো'আ হবে বিদ'আত। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

'যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যে বিষয়ে আমাদের কোন অনুমোদন নেই তা পরিত্যাজ্য'।[১]

নিম্নে দো'আর কয়েকটি বিদ'আতী অবস্থা আলোচনা করা হ'লঃ

১. ফরয ছালাত শেষে সম্মিলিত দো'আঃ

ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদীদেরকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে দো'আ করা এবং মুক্তাদীগণের আমীন আমীন বলা একটি বিদ'আতী পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালাম ফিরানোর পর একাকী পড়ার মত দো'আ আমাদেরকে শিখিয়েছেন এবং এগুলি পড়ার নির্দেশ ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাহাবীগণকে প্রচলিত নিয়মে সালাম ফিরানোর পর কখনো সম্মিলিতভাবে দো'আ করেননি।

মূলতঃ ছালাতটাই মুমিনের শ্রেষ্ঠ দো'আ। ছানা, সূরা ফাতিহা, রুকূ, সিজদা সহ দুই সিজদার মাঝখানের কথাগুলিও শ্রেষ্ঠ দো'আ। এছাড়াও হাদীছে আছে যে, সিজদার সময় বান্দা তার প্রভুর সন্নিকটে পৌঁছে যায়। তখন দো'আ করলে দো'আ কবুল হয়।[২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাশাহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বেশী বেশী দো'আ করতেন।[৩]

২. ঈদের ছালাতের পর প্রচলিত দো'আঃ

ঈদের ছালাতের পর খুৎবা দেওয়া হয়, তারপর দেশ জাতির কল্যাণের জন্য দীর্ঘ মুনাজাত করা হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে খুৎবা শেষে মুনাজাত করেছেন এ ব্যাপারে কোন হাদীছ নেই। বরং অসংখ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রচলিত দো'আর ন্যায় দো'আ করেননি।

অনেকে নিম্নোক্ত হাদীছকে প্রচলিত দো'আর পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করতে চেষ্টা করেন। উম্মু আতিয়্যাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ঈদের দিন) আমাদেরকে বের হবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাই আমরা ঋতুবতী, যুবতী এবং তাবুতে অবস্থানকারিণী নারীদেরকে নিয়ে বের হ'তাম-

فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتِهِمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلاَّهُمْ–

'অতঃপর ঋতুবতী মহিলাগণ মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের দো'আয় অংশগ্রহণ করতেন। তবে ঈদগাহে পৃথক অবস্থান করতেন'।[৪]

* *তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

১. *মুসলিম হা/১৭১৮; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৬৪৭।*

২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪।*

৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৩।*

৪. *বঙ্গানুবাদ বুখারী, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন), হা/৯২৪; বঙ্গানুবাদ বুখারী, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী) হা/৯২৯; বঙ্গানুবাদ বুখারী, (তাওহীদ প্রেস), হা/৯৮১।*

এ হাদীছে দো‘আর কথা আছে কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো‘আ কখন, কোথায়, কিভাবে করতেন তার বর্ণনা নেই। আমরা যদি অন্য হাদীছ থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর ঈদের ছালাতের কার্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য করি তাহ’লে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ফুটে ওঠেঃ

* রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় করতেন, তারপর খুৎবা দিতেন। খুৎবা সমাপ্ত হ’লে মহিলাদের জামা‘আতে গিয়ে তাদেরকে উপদেশ দিতেন।[৫]

এছাড়া রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায়ের পর ঘোষণা দিতেন, আমরা ঈদের ছালাত সম্পূর্ণ করে ফেলেছি, যে খুৎবার জন্য বসতে পসন্দ কর সে বস, আর যে চলে যাওয়া পসন্দ কর চলে যাও।[৬]

বুখারী ও মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী ঈদগাহের বিশেষ দো‘আ হচ্ছে তাকবীর, তাহমীদ বা আল্লাহ আকবার ও আল-হামদুলিল্লাহ। এই দো‘আ গুলো হ’ল-

الله اكبر الله اكبر لا إلـه إلا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر كبيرًا وَالحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا–

উম্মু আত্বিয়া বর্ণিত হাদীছে ঈদের দিনের যে দো‘আয় ঋতুবতীদেরকেও শরীক হওয়ার জন্য তাকীদ দেয়া হয়েছে, সেই দো‘আ বলতে ঐ তাকবীরই উদ্দেশ্য। এটা উম্মু আত্বিয়ার অপর এক বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে। উম্মু আত্বিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে দুই ঈদে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হ’ত, পর্দাশীলা ও কুমারীদেরকেও। তিনি বলেন, ঋতুবতীরাও বের হ’ত। তারা কাতারের পিছনে অবস্থান করত এবং মানুষের সাথে তাকবীর পাঠ করত।[৭]

৩. মৃতব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের পাশে সম্মিলিত দো‘আঃ

আজকাল জানাযার ছালাত আদায়ের পর মৃতব্যক্তিকে দাফন করে সম্মিলিতভাবে তার জন্য দো‘আ করা হয়। এ দো‘আও বিদ‘আত। জানাযার ছালাতই হ’ল মৃতের জন্য দো‘আর একমাত্র অনুষ্ঠান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَـهُ الدُّعَاءَ، ‘যখন তোমরা জানাযার ছালাত আদায় করবে বা মৃতের জন্য দো‘আ করবে, তখন তার জন্য খালেছ অন্তরে দো‘আ করবে’।[৮] তবে মৃতব্যক্তিকে দাফন করার পর কেউ ইচ্ছা করলে একাকী মনে মনে মৃতব্যক্তির জন্য দো‘আ করতে পারেন।

দো‘আর আদবঃ

দো‘আ একটি ইবাদত। মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন কিছু পাওয়ার জন্য দো‘আ করার সময় সঠিক আদব সহকারে দো‘আ করতে হবে। যেমনঃ

১. একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহকে ডাকাঃ

দো‘আ একমাত্র আল্লাহ্র কাছে করতে হবে। আল্লাহ্র সাথে অন্যকে ডাকা যাবে না। আল্লাহ বলেন,

وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلاَ تَدْعُوْا مَعَ اللهِ أَحَدًا

‘মসজিদ সমূহ আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতের জন্য, অতএব তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে ডেকো না’ *(জিন ১৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনু আব্বাসকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

يَاغُلاَمُ إِنِّىْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، اِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهِ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ،

‘ওহে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, আল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও অনুসরণ কর, আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। আল্লাহ্র হক আদায় কর, তাঁকে তোমার সাথে পাবে। যখন কোন কিছু চাইবে আল্লাহ্র কাছেই চাইবে। আর যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহ্র কাছেই চাইবে’।[৯]

২. আল্লাহ্র প্রশংসা করা ও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করাঃ

দো‘আ করার আগে আল্লাহ্র হামদ-ছানা বা প্রশংসা করতে হবে। সাথে সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে ছালাতে দো‘আ করতে শুনলেন। কিন্তু সে দো‘আয় মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করল না এবং রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদও পড়ল না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি তাড়াহুড়া করছে। তারপর তাকে ডাকলেন এবং বললেন বা অন্য কাউকে বললেন, ‘যখন তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করে, তার উচিত মহান প্রভুর হামদ ও ছানা দিয়েই শুরু করা ও তারপর নবীর উপর দরূদ পড়া। এরপর নিজের ইচ্ছা মতো দো‘আ করা উচিত।[১০]

---

৫. *বঙ্গানুবাদ বুখারী, (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন), হা/৯২৭; বঙ্গানুবাদ বুখারী, (আধুনিক প্রকাশনী), হা/৯২২।*
৬. *ইবনু মাজাহ ১/৪১০পৃঃ, হা/১২৯০; নাসাঈ ৩/১৮৫পৃঃ।*
৭. *মুসলিম ৬/১৭৯পৃঃ।*
৮. *আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৭৪।*
৯. *তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন ২/৬২পৃঃ।*
১০. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪০৪।*

৩. দো'আয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করা এবং কবুল হওয়ার ব্যাপারে আস্থা রাখাঃ

এটা তখনই সম্ভব যখন মানুষ আল্লাহ্র পরিচয় জানতে পারে, তাঁর কুদরত, তাঁর সম্মান ও তাঁর ওয়াদা সত্য হওয়ার ব্যাপারে যথাযথ জ্ঞানার্জন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ إِنْ شِئْتَ وَارْحَمْنِيْ إِنْ شِئْتَ وَارْزُقْنِيْ إِنْ شِئْتَ.

'তোমাদের কেউ যেন দো'আর মধ্যে না বলে, 'হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও তাহ'লে আমাকে ক্ষমা কর, তুমি চাইলে আমার প্রতি অনুগ্রহ কর এবং তুমি চাইলে আমাকে রিযিক দাও'।[১১]

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

اُدْعُوْا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَهُ.

'তোমরা আল্লাহকে নিশ্চিত জবাবের আশায় ডাক। আর জেনে রাখ, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির দো'আয় সাড়া দেন না, যে তার দো'আ সম্পর্কে গাফেল থাকে'।[১২]

৪. বিনয়, একাগ্রতা, আল্লাহ্র অনুগ্রহের আশা ও শাস্তির ভয় থাকাঃ

আল্লাহ্র বাণী وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً،

'তোমার প্রতিপালককে মনে মনে ক্রন্দনরত ও ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় স্মরণ কর' *(আ'রাফ ২০৫)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ–

'তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত' *(আম্বিয়া ৯০)*।

৫. দো'আর সময় নিজের দরিদ্রতা প্রকাশ করা, নিজের দুর্বলতা ও মুছীবতের কথা উল্লেখ করে দো'আ করাঃ

আইয়ুব (আঃ) যখন দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হ'লেন, তখন তিনি তাঁর অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করেন এভাবে-

وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادى رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

১১. *বুখারী হা/৭৪৭৭।*
১২. *তিরমিযী, হাকেম, সিলসিলা ছহীহা হা/৫৯৪।*

'স্মরণ করুন আইয়ুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান' *(আম্বিয়া ৮৩)*।

হযরত যাকারিয়া (আঃ) দো'আ করে ছিলেন এভাবে-

وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادى رَبَّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

'আর যাকারিয়ার কথা স্মরণ করুন, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিছ' *(আম্বিয়া ৮৯)*।

৬. আল্লাহ্র সুন্দর নাম সমূহ ও উন্নত গুণাবলীর মাধ্যমে দো'আ করাঃ

আল্লাহ বলেন, وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنى فَادْعُوْهُ بِهَا،

'আর আল্লাহ্র জন্য উত্তম নাম সমূহ রয়েছে। কাজেই তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে' *(আ'রাফ ১৮০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রে উঠে আল্লাহ্র উত্তম নাম সম্বলিত নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তেনঃ

اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّموَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّموَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَالِكُ السَّموَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَ وَعْدُكَ الْحَقُّ وَ لِقَائُكَ حَقٌّ وَ قَوْلُكَ حَقٌّ وَ الْجَنَّةُ حَقٌّ وَ النَّارُ حَقٌّ وَ النَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَ مُحَمَّدٌ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْكَ أَنَبْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أَخَّرْتُ وَ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ وَ لاَ إِلهَ غَيْرُكَ.

'হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। আসমান, যমীন এবং এদের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে সবকিছুর তুমিই অধিকর্তা। প্রশংসা মাত্রই তোমার। আসমান, যমীন এবং এদের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে, তুমি সবকিছুর নূর বা জ্যোতি। (হে আল্লাহ!) প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য। আসমান, যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তুমি ঐ সবের প্রতিপালক। (হে আল্লাহ!) প্রশংসা মাত্রই তোমার। আসমান ও যমীনের রাজত্ব

তোমার। সকল গুণকীর্তন তোমার জন্যই। তুমি সত্য, তোমার অঙ্গীকার সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমার দর্শন লাভ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ সত্য এবং ক্বিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! তোমার নিকটে আত্মসমর্পন করলাম, তোমারই উপর নির্ভরশীল হ'লাম, তোমার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হ'লাম, তোমারই সাহায্যের প্রত্যাশায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লাম এবং তোমাকেই বিচারক নির্ধারণ করলাম। অতএব আমার পূর্বের ও পরের গোপনীয় এবং প্রকাশ্য দুষ্কর্ম সমূহ মাফ করে দাও। তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই'।[১৩]

৭. গুণাহের কথা স্মরণ করাঃ

দো'আ করার সময় নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করবে ও লজ্জিত হয়ে দো'আ করবে। যেমন সাইয়্যেদুল ইস্তিগফারে রাসূল (ছাঃ) শিখিয়েছেন,

اَللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لاَ إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِى وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَّى وَ أَبُوْ بِذَنْبِى فَاغْفِرْلِى فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ-

'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই বান্দা। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত ওয়াদা পালনে বদ্ধপরিকর। আমি যা করেছি তার খারাপ প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় চাই। তুমি আমাকে যেসব নে'মত দিয়েছ তা স্বীকার করি। আমি আমার অপরাধও স্বীকার করি। অতএব আমাকে মাফ কর'।[১৪]

৮. বৈধ বিষয় লাভের জন্য দো'আ করাঃ

দো'আকারীকে বৈধ বিষয় লাভের জন্য দো'আ করতে হবে। তাতে কোন গুণাহের বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের কথা থাকতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ تَوَافِقُوْا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبُ لَكُمْ.

'নিজের জন্য বদ দো'আ করো না, নিজের সন্তানদের জন্য বদ দো'আ করো না, নিজের সম্পদের ব্যাপারে বদ দো'আ করো না। কারণ এই বদ দো'আর সময়টি সেই সময়ে পড়ে যেতে পারে, যে সময় আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করে দো'আ করলে কবুল করা হয়। এভাবে এই বদ দো'আটিও কবুল হয়ে যেতে পারে'।[১৫]

يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَيَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رِحْمٍ.

'কোন গুণাহের বা রক্ত সম্পর্ক ছিন্নের দো'আ ব্যতীত অন্য সব দো'আ কবুল করা হয়'।[১৬]

৯. নেক আমলের মাধ্যমে দো'আ করাঃ

এখানে ঐ প্রসিদ্ধ হাদীছটি উল্লেখযোগ্য, যে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনজন লোক কোন গুহায় আটকা পড়ে যায়, তখন তারা তাদের জীবনের উল্লেখযোগ্য নেক আমলের দ্বারা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

প্রথমজন পিতা-মাতার খেদমতের কথা, দ্বিতীয়জন ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার কথা, তৃতীয়জন আমানত রক্ষা করার কথা উল্লেখ করে বলেন,

اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَاخْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ.

'হে আল্লাহ! আমি যদি তোমারই সন্তোষ লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তবে আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। তারপর আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দেন ও বিপদ থেকে রক্ষা করেন'।[১৭]

কুরআনে জ্ঞানীদের দো'আ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ أَمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَأَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ.

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন, তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে' *(আলে ইমরান ১৯৩)*।

১০. বেশী বেশী দো'আ করাঃ

মহান আল্লাহ্‌র ফযীলতের কথা স্মরণ করে বার বার দো'আ করতে হবে। একবার দো'আ করে কবুল না হ'লে দো'আ থেকে বিরত থাকা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثِرْ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ،

১৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ১০৭ হা/১২১১ 'রাতে ছালাতে দাঁড়ানোর সময় কি বলবে' অনুচ্ছেদ।*
১৪. *বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৮৭৫।*
১৫. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪৯৭।*
১৬. *মুসলিম হা/২৭৩৫।*
১৭. *বুখারী, মুসলিম হা/২৭৪৩; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১২।*

Contents

'তোমাদের কেউ যখন দো'আ করে তখন সে যেন বার বার দো'আ করে, কারণ সে তার প্রভুকে ডাকে'।[১৮]

অন্য হাদীছে আছে

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو لَيْسَ بِإِثْمٍ وَلاَ بِقَطِيْعَةِ رَحْمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِحْدٰى ثَلاَثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلِهَا.

'কোন মুসলিম যদি আল্লাহকে ডাকে আর ডাকার মাঝে কোন গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের কথা না থাকে, তাহ'লে দো'আর তিনটি অবস্থার একটি হবে। হয় দো'আটি তাড়াতাড়ি কবুল হবে কিংবা আখেরাতের জন্য জমা রাখা হবে নতুবা তার বিনিময় সমপরিমাণ অকল্যাণ দূর করা হবে। তখন একজন ছাহাবী বললেন, তাহ'লে আমরা বেশী করে দো'আ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহও বেশী করে দিবেন'।[১৯] তাই একবার দো'আ করে কবুল না হ'লে দো'আ করা থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না।

১১. সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র কাছে দো'আ করাঃ

মানুষের অভ্যাস হ'ল দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন, বিপদাপদ আসলেই আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা। অথচ দো'আ করতে হবে সর্বাবস্থায়। চাই দুঃখের সময় হোক বা সুখের সময় হোক। আল্লাহ্র বাণীঃ

وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانْ لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–

'আর যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে, তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়েও। অতঃপর যখন আমি সেই কষ্ট তার থেকে দূর করে দেই, তখন সে নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য সে যেন আমাকে কখনো ডাকেইনি। এই সীমালংঘনকারীদের কার্যকলাপ তাদের কাছে এইরূপই পসন্দনীয় মনে হয়' *(ইউনুস ১২)*।

১২. দো'আকে তিনবার করে পুনরাবৃত্তি করাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করলে তিন বার করে বলতেন। হাদীছে আছে,

وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاَثًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاَثًا

'যখন তিনি ডাকতেন, তিনবার ডাকতেন এবং যখন তিনি চাইতেন, তিনবার চাইতেন।

১৩. দো'আর মধ্যে আওয়ায নীচু করাঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ–

'তোমরা বিনীতভাবে ও সঙ্গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকবে। তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৫৫)*।

আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদেরকে প্রার্থনা করার নিয়ম-নীতি শিক্ষা দিয়েছেন, যা তাদের জন্য দ্বীন ও দুনিয়ায় মুক্তি লাভের মাধ্যম। তিনি বলেন, তোমরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সঙ্গোপনে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর। যেমন তিনি যখন বললেন, 'প্রভুকে স্বীয় অন্তরে স্মরণ কর' জনগণ উচ্চস্বরে প্রার্থনা করতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের নফসের উপর দয়া কর। তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। তোমরা যাঁর নিকট প্রার্থনা করছ, তিনি নিকটেই রয়েছেন এবং সবকিছু শুনছেন'।[২০]

১৪. দো'আর পূর্বে অযু করাঃ

আবু মূসা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছ থেকে দো'আর পূর্বে অযূ করা প্রমাণিত হয়। হুনাইনের যুদ্ধের পর যখন আবু আমের রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসেন এবং তিনি তার জন্য দো'আ করার ইচ্ছা করলেন, তিনি পানি আনতে বললেন। অতঃপর অযূ করে দো'আ করলেন, اَللّٰهُـمَّ اغْفِـرْ لِعُبَيْدٍ أَبِيْ عَامِرٍ 'হে আল্লাহ! উবাইদ আবি আমেরকে ক্ষমা কর'।[২১]

১৫. কিবলামুখী হয়ে দো'আ করাঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বামুখী হ'লেন এবং কুরাইশদের একটি দলের জন্য বদদো'আ করলেন'।[২২]

[চলবে]

১৮. *মুসলিম।*
১৯. *বুখারী, ছহীহ আদাবুল মুফরাদ (তাহক্বীক্ব, আলবাণী, হা/১২৫০।*
২০. *তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা আ'রাফের ৫৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।*
২১. *ফৎহুল বারী ৭/৬৩৯।*
২২. *বুখারী হা/৩৯৬০; মুসলিম হা/১৭৯৪।*

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতঃ প্রেক্ষিত আহলেহাদীছ

*আবু তাহের বিন আব্দুর রহমান**

উপক্রমনিকাঃ

আল্লাহ্র মনোনীত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হ’ল ইসলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ’লেও সত্য যে, ইসলামে ৩৭ হিজরীতে রাজনৈতিক কারণে শী‘আ ও খারেজী এবং পরবর্তী সময়ে আক্বীদাগত কারণে জাহমিয়া, মুরজিয়া, আশ‘আরিয়া ও ফিক্বহী মাসআলাগত কারণে হানাফী, শাফেঈ, হাম্বলী, মালেকী প্রভৃতি দলের উদ্ভব হয়। পরবর্তীতে এইসব ফির্কাবন্দীর আলোকে বিভিন্ন নামে মানুষ আখ্যায়িত হ’তে থাকে। বিভিন্ন ফির্কার সঙ্গে মানুষ জড়িত হওয়ার পরও মূল দ্বীনকে অবিকলভাবে যারা আকঁড়ে ধরে থাকেন তারা পৃথিবীতে বিভিন্ন নামে পরিচিত হন। ভারত উপমহাদেশে তারা হ’লেন আহলেহাদীছ। আর যারা ফিক্বহী কারণে মূল ইসলাম থেকে একটু দূরে অবস্থান নেন তারা তাদের ইমামের নামে পরিচিত হন। যেমন হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী প্রভৃতি। অতঃপর ঐসব দলের অনুসারীরা তাদের আক্বীদা ও আমলের ভিত্তিতে প্রধানতঃ দু’টি দলে বিভক্ত হয়। যাদের আক্বীদা ভাল ও হক্বের কাছাকাছি তারা সবাই মিলে একদল, অর্থাৎ তারাই হ’লেন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত। এ দলের অন্তর্ভুক্ত হ’লেন আহলেহাদীছ, সালাফী ও অনুরূপ খাঁটি মুসলিম সহ চার মাযহাবের অনুসারীগণ। কারণ চার মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে ইসলামী বিধিবিধান মানার ক্ষেত্রে পারস্পরিক মতবিরোধ থাকলেও তাদের মধ্যে এমন কোন দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় না, যার কারণে মুসলিম উম্মাহ তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে একমত হ’তে পারে। বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত-এর শামিল হওয়ার বিষয়ে সবাই একমত। পক্ষান্তরে যাদের আক্বীদা ভাল নয় আমলও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বা দলীল মাফিক নয় তারা এর বহির্ভূত। তারা হ’ল শী‘আ, মু‘তাযিলা, মুরজিয়া, কাদিরিয়া, জাহমিয়া, কাদিয়ানী প্রভৃতি। এ প্রবন্ধে আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত ও আহলেহাদীছের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আহলেহাদীছ পরিচিতিঃ

‘আহলেহাদীছ’ পরিচিতি নিয়ে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কেউ কেউ আহলেহাদীছের আদর্শকে গ্রহণ করতে না পেরে স্বীয় পুঞ্জীভূত হিংসা ও ক্ষোভের তাড়নায় এটাকে পথভ্রষ্ট জাহান্নামী ফির্কা ও ইংরেজদের দেয়া ‘ওহাবী’ নামে আখ্যায়িত করতেও সংকোচবোধ করেনি। এতদসংক্রান্ত ধূম্রজাল দূর করার নিমিত্তে আলোচ্য নিবন্ধে আহলেহাদীছের প্রকৃত পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হ’লঃ

আভিধানিক অর্থঃ

আহলেহাদীছ দু’টি পদে বিভক্ত। একটি ‘আহল’ (أهـل) অপরটি ‘হাদীছ’ (حـديث)। ফার্সী ব্যাকরণ অনুযায়ী সম্বন্ধ পদ হিসাবে ‘আহলেহাদীছ’ হয়েছে, যা আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী ‘আহলুলহাদীছ’ হয়। শব্দটি ভারত উপমহাদেশে অত্যধিক ব্যবহৃত হওয়ায় ফার্সী ভাষার নিয়মানুযায়ী ‘আহলেহাদীছ’ হিসাবে পরিচিত। ‘আহল’ অর্থ সদস্য, অধিকারী, অনুসারী, অধিবাসী ইত্যাদি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فِيْـهِ ‘ইঞ্জীলের অনুসারীদের উচিত আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা করা’ *(মায়েদা ৪৭)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইঞ্জীলের অনুসারীদেরকে ‘আহলুল ইঞ্জীল’ বলেছেন। অনুরূপভাবে আরবী সাহিত্যে ইসলামের অনুসারীদেরকে ‘আহলুল ইসলাম’[১], একই মাযহাবের অনুসারীদেরকে ‘আহলুল মাযহাব’[২], রায়-এর অনুসারীদেরকে ‘আহলুর রায়’[৩], বিদ‘আত-এর অনুসারীদেরকে ‘আহলুল বিদ‘আত’, সুন্নাতের অনুসারীদেরকে ‘আহলুস সুন্নাত’ বলা হয়।[৪] শব্দটি কোন বস্তুর প্রতি সম্বোধিত হ’লে মালিক, সাথী ও বিশেষজ্ঞ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যথা- বাড়ীর মালিক বা গৃহবাসীকে ‘আহলুদ দিয়ার’, লেখক, কলামিষ্ট, প্রতিবেদক, প্রবন্ধকার, নিবন্ধকারকে ‘আহলুল কালাম’ বলে।[৫] এ অর্থে হাদীছ

---

* *দাওরায়ে হাদীছ; বি.এ, অনার্স, এম,এ (হাদীছ); ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া; কামিল (ফিক্বহ); দাঈ: সঊদী দূতাবাস, বাংলাদেশ অফিস।*

১. *ইবনু মানযূর আফ্রীকী মিসরী, লিসানুল আরব (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তাবি.), ১১শ’ খণ্ড, পৃঃ ২৮।*
২. *আহমদ ইবনু ফারিস, মু’জামু মিক্বইয়াসিল লুগাহ, তাহক্বীক্বঃ আব্দুস সালাম মুহাম্মাদ হারুন (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৭৯ ইং), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫০।*
৩. *শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খণ্ড, (মিসর ছাপাঃ ১৩২২ হিঃ), পৃঃ ১২৯।*
৪. *ছহীহ মুসলিম, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৩ ইং), মুক্বাদ্দামাহ, পৃঃ ১৫।*
৫. *আল-মু’জামুল ওয়াসীত (দেওবন্দঃ হুসায়নিয়া লাইব্রেরী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭ ইং), পৃঃ ৩১।*

বিশেষজ্ঞ বা মুহাদ্দিছগণকেও 'আহলুল হাদীছ' বলা হয়।[৬] হাদীছ (حَدِيْثٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হ'ল নতুন ও এমন নবোদ্ভূত বিষয়, পূর্বে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না।[৭] আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) (১৯১৪-১৯৯৯ইং) বলেন, هوالكلام الذى يتحدث به و ينقل بالصوت والكتابة

'হাদীছ হ'ল এমন বাক্য, যার সমন্বয়ে কথা বলা হয় এবং শব্দ ও লিপি আকারে নিঃসৃত হয়।[৮] ইংরেজীতে বলা হয় Narrative, Talk।[৯] পবিত্র কুরআনের একটি নাম 'হাদীছ'।[১০] স্বয়ং আল্লাহ স্বয়ং বহুবার পবিত্র কুরআনকে হাদীছ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন- আল্লাহ বলেন, فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لاَيَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا 'পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হ'ত, যারা কখনও হাদীছ বুঝতে চেষ্টা করে না' *(নিসা ৭৮)*। فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ 'এরপর তারা কোন হাদীছের প্রতি ঈমান আনবে' *(আ'রাফ ১৮৫)*। আল্লামা জালালুদ্দীন সয়ূত্বী (রহঃ) বলেন, এখানে 'হাদীছ' অর্থ হ'ল আল-কুরআন।[১১]

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِى الْأَلْبَابِ ط مَاكَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ-

'তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়। এটা কোন মনগড়া কথা (হাদীছ) নয়, কিন্তু (এই হাদীছে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য পূর্ববর্তী কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ, হেদায়াত, দিক-নির্দেশনা ও রহমত রয়েছে' *(ইউসুফ ১১১)*। মুফাসসিরগণ বলেছেন, এখানে 'হাদীছ' শব্দের অর্থ আল-কুরআন।[১২]

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهَذَا الْحَدِيْثِ أَسَفًا-

'তারা এই হাদীছ বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ আপনি আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন' *(কাহফ ৬)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এখানে 'হাদীছ' অর্থ কুরআন।[১৩]

اَللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ

'আল্লাহ উত্তম হাদীছ অবতীর্ণ করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃপুনঃ পঠিত' *(যুমার ২৩)*। এখানে 'হাদীছ' অর্থ আল-কুরআন।[১৪] এভাবে আরো বহু স্থানে কুরআনকে আল্লাহ পাক হাদীছ নামে অভিহিত করেছেন।

হাদীছেও কুরআনকে হাদীছ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ 'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম হাদীছ হ'ল আল্লাহ্র কিতাব'।[১৫]

বিশ্বের সকল মুসলিম একমত যে, শারঈ পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে হাদীছ বলা হয়।[১৬] যেমন বিশিষ্ট ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنْ لاَّ يَسْأَلَنِىْ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ، 'তোমার পূর্বে এই হাদীছ সম্পর্কে আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি'।[১৭]

সারকথা হ'ল আল-কুরআন আল্লাহ্র হাদীছ। তেমনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণীও হাদীছ। অতএব 'আহলেহাদীছ' অর্থ হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী। এ অর্থেই ছাহাবীদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সকল নির্ভেজাল মুসলিমকে 'আহলেহাদীছ' নামে অভিহিত করা হয়। আর এই আদর্শিক সংগ্রামই 'আহলেহাদীছ

---

৬. *ডঃ মাহমূদ ত্বহহান, তাইসীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ, পৃঃ ৯৯; মুক্বাদ্দামাতু ইবনিছ ছালাহ (বোম্বাইঃ ১৩৫৭ হিঃ), পৃঃ ৭২-৭৩; আবু বকর আহমদ বিন আলী খতীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ (লাহোরঃ রিপন প্রেস, তাবি), পৃঃ ১২।*
৭. *মু'জামু মিক্বইয়াসিল লুগাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১।*
৮. *আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী, আল-হাদীছু হুজ্জিয়্যাতুন (কুয়েতঃ দারুস সালাফিয়্যাহ, ১৯৮৬ ইং), পৃঃ ১৫।*
৯. *Encyclopaedia of Islam (Leiden: E.J.Brill, 1971) Vol. 111, p-23.*
১০. *ডঃ মোহাম্মাদ বেলাল হোসেন, উলূমুল হাদীছ (রাজশাহীঃ সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, প্রথম প্রকাশ, ২০০২ইং), পৃঃ ৩১।*
১১. *জালালুদ্দীন সয়ূত্বী, তাফসীরে জালালাইন (দিল্লীঃ ১৯৩৭ ইং), পৃঃ ১৪৫।*
১২. *তাফসীরে জালালাইন, পৃঃ ১৯৯; হাফেয ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৭।*
১৩. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৯।*
১৪. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৫; তাফসীরে জালালাইন, পৃঃ ৩৮৭।*
১৫. *মুসলিম, মিশকাতুল মাছাবীহ (দিল্লীঃ আছাহ্হুল মাতাবে, ১৯৩২ খৃঃ), পৃঃ ২৭।*
১৬. *শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী, মিনাকাতুল মাছাবীহ-এর মুক্বাদ্দামা, পৃঃ ১; আবদুল করীম মুরাদ, মিন আত্বয়াবিল মিনাহ ফী ইলমিল মুছত্বলাহ (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, তাবি), পৃঃ ৬; উলূমুল হাদীছ ওয়া মুছত্বলাহুহু, পৃঃ ৫; তাইসীরুল মুছত্বলাহিল হাদীছ, পৃঃ ১৪।*
১৭. *ছহীহ বুখারী (মীরাটঃ হাশেমী প্রেস, ১৩২৮ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৭২।*

আন্দোলন' নামে ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে।[১৮]

পারিভাষিক অর্থঃ

পারিভাষিক অর্থে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয়। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্বনামধন্য গবেষকবৃন্দ বলেন,

AHL-I-HADITH: The followers of prophetic traditions, who profess to hold the same view as the early Ashab al-hadith or Ahl-al-hadith (as opposed to Ahl-al-ray). They do not hold themselves bound by 'Taklid'... but consider themselves free to seek guidance in matters of religious faith and practices from the authentic traditions which together with the Quran are in their view the only worthy guide for the true muslims.

'আহলেহাদীছ' বলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের অনুসারী দলকে বুঝায়। যারা প্রাথমিক যুগের আহলেহাদীছ বা আছহাবে হাদীছের ন্যায় মত পোষণ করে থাকেন (আহলুর রায়-এর বিপরীত)। যারা তাক্বলীদের বন্ধনকে স্বীকার করেন না...। বরং স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে থাকেন। যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই একজন প্রকৃত মুসলিমের জন্য যথার্থ পথপ্রদর্শক বলে মনে করেন।[১৯]

টাইটাস মার্রে বলেন,

Whatever the Prophet Muhammad taught in the Quran and the authoritative Traditions (Ahadith Sahih), that alone is the basis of the religion known as the Ahl-i-hadith.

'কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, একমাত্র তাকেই যারা দ্বীনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন, তারাই হ'লেন আহলেহাদীছ'।[২০]

আল্লামা হাসান বিন মুহাম্মাদ নাসওয়ারী বলেন,

أهل الحديث همو أهل النبى * إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا،

'নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসারীরাই হ'ল আহলেহাদীছ, যদিও তারা তাঁর সাহচর্য লাভ করেননি। কিন্তু তাঁর হাদীছের সাহচর্য লাভ করেছেন'।[২১]

মোদ্দাকথা যারা সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'তে সরাসরি অথবা তার ভিত্তিতে প্রদত্ত ফায়ছালাকে সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন ও নিঃশর্তভাবে তা গ্রহণ করেন, তাদেরকেই 'আহলেহাদীছ' বলা হয়।[২২]

আহলেহাদীছ নামকরণের কারণঃ

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, আহলেহাদীছ কোন জাতীয় নাম নয়। মুসলিম ও আহলেহাদীছ একই অর্থবোধক শব্দ। তবে মুসলিম হ'ল জাতীয় নাম। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

هُوَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِى هَذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَـهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ،

'তিনিই পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই কুরআনেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হন এবং তোমরা যেন সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য' *(হজ্জ ৭৮)*। এই মুসলিমকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গুণবাচক নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন মুমিন, মুত্তাক্বী, মুহসিন, আনছার, মুহাজির, আহলে কুরআন ইত্যাদি। অনুরূপ একটি গুণবাচক নাম হ'ল 'আহলেহাদীছ'।[২৩] এই নাম কোন ইমাম বা দার্শনিক পণ্ডিতের চিন্তাপ্রসূত নাম নয়। বরং নির্ভেজাল মুসলিমগণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণের জন্য এই বৈশিষ্ট্যবাচক নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। অনেকে আহলেহাদীছকে প্রচলিত মাযহাবী দলের ন্যায় নতুন সৃষ্ট কোন দল ভাবেন। অথচ এটা সর্বৈব মিথ্যা ও মহা অন্যায়।

---

১৮. *ডঃ এ.বি.এম. হাবীবুর রহমান চৌধুরীর বাণী, আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ১৬।*

১৯. *এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (লাইডেন, ব্রীল, ১৯৬০ইং), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৯; আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন, পৃঃ ৫০-৫১।*

২০. *টাইটাস মার্রে, ইন্ডিয়ান ইসলাম (নিউ দিল্লীঃ ওরিয়েনটেড বুকস রিপ্রিন্ট করপোরেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৯ খৃঃ), পৃঃ ১৮৯।*

২১. *শায়খ ইব্রাহীম খলীল হাশিমী, ছাফাহাতুম মুশরিকাহমিন হায়াতি শায়খিনাল আল্লামা আলবানী (মাকতাবাতুছ ছাহাবা, প্রথম সংস্করণ, ২০০২ ইং), পৃঃ ১৪২।*

২২. *ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণঃ ১৯৯৬ খৃঃ), পৃঃ ৬৫।*

২৩. *বঙ্গানুবাদ তিরমিযী (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮), পৃঃ ৩৩৪, সনদ হাসান।*

খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হিঃ) বলেন, লোকেরা ইতিপূর্বে কখনও হাদীছের সনদ বা সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগ আসলো, তখন লোকেরা বলতে লাগল, আগে তোমরা বর্ণনাকারীদের পরিচয় বল। অতঃপর যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, তাহ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। পক্ষান্তরে বর্ণনাকারী 'আহলে বিদ'আত'-এর অন্তর্ভুক্ত হ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না।[২৪]

এখানে মুসলমানদের দু'টি দলে বিভক্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। (১) আহলুস সুন্নাত (২) আহলুল বিদ'আত। অথচ দল দু'টি কেউই প্রতিষ্ঠা করেনি। বরং ছহীহ আমলের কারণে কেউ 'আহলুস সুন্নাত' ও বিদ'আতী আমলের জন্য 'আহলুল বিদ'আত' বলে আখ্যায়িত হয়। যেমন ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) পীর পূজারী দল (২) পীর বিরোধী দল। অথচ এরূপ দল কেউ কায়েম করেনি; বরং আদর্শের ভিত্তিতে উক্ত দল দু'টি সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপ ফির্কাবন্দী ও যাবতীয় শির্ক-বিদ'আত বর্জন করার কারণে খাঁটি মুসলমানগণ বিভিন্ন গুণবাচক নামে অভিহিত হন। ভারতবর্ষে তারা 'আহলেহাদীছ' নামে বেশী পরিচিত। এই অভ্রান্ত আদর্শের অনুসারীরা নিজেদের বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উক্ত নামের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিজেদের দাওয়াতী সংগঠনের নামকরণ করেন। যেমন 'গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' (১৮৯৫ খৃঃ) অল-ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স (১৯০৬ খৃঃ) 'আঞ্জুমানে আহলেহাদিস বাঙ্গালা ও আসাম' (১৯১৪ খৃঃ) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' (১৯৭৮ খৃঃ), 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' (১৯৯৪ খৃঃ) প্রভৃতি।

উল্লেখ্য, সাংগঠনিক দলের প্রতিষ্ঠাকাল ও তার প্রতিষ্ঠাতা, আমীর বা সভাপতি আছেন। এর অর্থ এই নয় যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর প্রতিষ্ঠাতা ঐসব নেতৃবৃন্দ। তাদের পূর্বে ঐ নামে কোন সংগঠন নাও থাকতে পারে। কিন্তু আহলেহাদীছ আদর্শের লোক ও ঐ আন্দোলন অবশ্যই ছিল। যেমন মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, তার পূর্বে মুসলিম ছিল না। অপরদিকে কেউ কেউ বলেন, আহলেহাদীছ যদি কোন মনীষীর প্রতিষ্ঠিত দলই না হবে, তাহ'লে ইবনু তায়মিয়া (৬৬১-৭২৮), ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১), ইমাম শাওকানী, মুহাম্মাদ বিন নছর আল-মারওয়াযী (২০২-২৯৪) প্রমুখ ব্যক্তি আহলেহাদীছের ইমাম বা নেতা হ'লেন কি করে? যেমন আল্লামা হাকিম মুহাম্মাদ বিন নছর মারওয়াযীর প্রসঙ্গে বলা হয়, كَانَ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ بِلاَ مُدَافِعَةٍ 'তিনি স্বীয় যুগে আহলেহাদীছের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম ছিলেন'।[২৫]

এর জবাব হ'ল- তাঁরা কেউই তথাকথিত দলীয় নেতা ছিলেন না। বরং তাঁরা ছিলেন আদর্শিক নেতা। যেমন ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ)-কে 'ইমামুল মুহাদ্দিছীন' বা মুহাদ্দিছগণের ইমাম বলা হয়। অথচ আজও দুনিয়াব্যাপী মুহাদ্দিছগণের নির্দিষ্ট কোন দল কায়েম হয়নি। এটা ইলমে হাদীছে তাঁর অপরসীম যোগ্যতার ফসল। যেমন করে বর্তমানে আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানীকে আহলেহাদীছ-এর ইমাম বলা হচ্ছে। অথচ তিনি কোন আহলেহাদীছ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না।[২৬] এরপরও তিনি সমগ্র বিশ্বে আহলেহাদীছ-এর ইমাম। এটিও তাঁর অতুলনীয় যোগ্যতার ও আদর্শিক আমলের জন্য হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ এ নয় যে, তাঁরা আহলেহাদীছ-এর নামকরণকারী বা প্রতিষ্ঠাতা।

[চলবে]

---

২৪. *মুক্বাদ্দামাহ মুসলিম, পৃঃ ১৫।*

২৫. *আল্লামা জালালুদ্দীন সয়ূতী, ত্বাবাকাতুল হুফফায, পৃঃ ২৮৫।*

২৬. *ছাফাহাতুম মুশরিকাহ মিন শায়খিনাল আল্লামা আলবানী, পৃঃ ১৪২।*

রাজশাহী শহরে কোন কোন জায়গায় পত্রিকা পাওয়া যায়

১। সালাফিয়া লাইব্রেরী, সোনাদীঘির মোড় (সমবায় মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে), রাজশাহী।
২। রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।
৪। বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী
৫। ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া (রূপালী ব্যাংকের নীচে), রাজশাহী।
। কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, গোরহাঙ্গা (নিউমার্কেটের উত্তরে)।
৭। ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৮। ইসলামিয়া লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৯। সাঝের মায়া, লক্ষ্মীপুর মোড়, রাজশাহী।
১০। আযাদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, রাজশাহী।
১১। পত্রিকা বিতান, বাটার মোড়, রাজশাহী।

চিকিৎসা জগত

সুস্থতায় নিরামিষ

শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়। পুরনো এই প্রবাদ বহু ব্যবহারে জীর্ণ নয়, আজও সমান সত্যি। আমাদের পরিপাকতন্ত্র এতটাই এডভান্স যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে মোটেও বেশী সময় লাগে না। আমাদের শরীরের প্রধান উপাদান প্রোটিন। আমরা দু'টো উৎস থেকে প্রোটিন খাবার পেয়ে থাকি। যথা- প্রাণীজ ও উদ্ভিজ উৎস। প্রাণীজ উৎসে প্রোটিনের পরিমাণ উদ্ভিজ উৎসের চেয়ে অনেক বেশী।

আমিষ নিরামিষের মূল পার্থক্য করা হয়েছে প্রোটিনের পরিমাণের কম বেশীর ভিত্তিতে। প্রোটিন বেশী মানেই আমিষ, আর কম হ'লেই তা নিরামিষের পর্যায়ে ফেলা হয়। এতে বোঝা যায় প্রাণীজ প্রোটিন মানেই আমিষ জাতীয় খাবার এবং উদ্ভিদ প্রেটিন মানেই নিরামিষ খাবার। প্রতিদিনকার খাবারে যদি অতিরিক্ত প্রাণীজ প্রোটিনের বেশী বেশী আগমন ঘটে তাহ'লে প্রোটিনের এই অতিরিক্ত বোঝা সহ্য করতে হয় কিডনী দু'টোকে। ফলে কিডনী হয়ে পড়ে ক্লান্ত এবং এতে জন্ম নেয় কিডনী সংক্রান্ত নানা সমস্যা। শুধু কিডনী সমস্যাই নয়, ক্যান্সার এবং হার্টের অসুখের মত ঝুঁকিপূর্ণ সমস্যারও সম্মুখীন হ'তে হয়।

আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরামিষ খাবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমিষ থেকে গুণে-মানে এবং বৈচিত্র্যে নিরামিষের পাল্লা অনেকখানি ভারী। আল্লাহ আমাদের জন্য সবই উজাড় করে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। শুধু চিনে বেছে খাওয়ার দায়িত্ব আমাদের। বছর জুড়ে প্রচুর শাক-সবজি আর ফলমূলের সম্ভারে পরিপূর্ণ এই প্রকৃতি। শাক-সবজি এবং ফলমূলে সবরকমের প্রোটিন, ভিটামিন এবং মিনারেলস রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে অ্যান্টি অক্সিডেন্টস, যা ফ্রি র‍্যাডিকেলসকে প্রশমিত করে দেহকে ক্যান্সারসহ নানা ঘাত-প্রতিঘাতের হাত থেকে রক্ষা করে। ফ্রি র‍্যাডিকেলস হ'ল এক ধরনের মুক্ত পরমাণু। এরা অনবরত স্থায়ী হওয়ার চেষ্টা করে। এরা অনবরত সেল মেমব্রেন, ডিএনএকে আক্রমণ করে। যার ফলে আরো ফ্রি র‍্যাডিকেলস তৈরী হয়- যতক্ষণ পর্যন্ত কোন অ্যান্টি অক্সিডেন্টস এদের নিষ্ক্রিয় না করে। আমাদের শরীর কিছু কিছু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট তৈরী করতে সক্ষম। তবে ধূমপান, অতিরিক্ত মানসিক চাপ, কায়িক পরিশ্রমের অভাব ও উল্টা-পাল্টা খাওয়া-দাওয়ার কারণে দেহের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট তৈরীর ক্ষমতা কমে যায়। ফলে দেহ ক্যান্সার, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপের মত নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে দ্রুত বার্ধক্যে পৌঁছে। টাটকা শাক-সবজি এবং ফলমূলে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্টস। যেমন- টমেটো, তরমুজ, নটেশাকে রয়েছে শক্তিশালী ক্যান্সার প্রতিরোধক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট লাইকোপিন। লাইকোপিন সমৃদ্ধ খাবার পাকস্থলী এবং প্রোস্টেট ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

পুঁইশাক, পালংশাক, ঢেঁড়শ, গাজর, বিট, বরবটি, মটরশুটি, লাউশাক ইত্যাদিতে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন, যা ফুসফুস ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে। রঙিন ফলমূল যেমন- পাকা পেঁপে, কমলালেবু, মিষ্টিকুমড়া, পাকা আম ইত্যাদিতে রয়েছে ক্রিপটোজ্যানথিন। আনারস, আমলকি, টমেটো, সবধরনের লেবু, পেয়ারা, বেদানা ইত্যাদিতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি। ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার গম, সয়াবিন, বিভিন্ন রকম ডালে আছে কপার, ভিটামিন-ই এবং ফাইটোইস্ট্রোজেন, যা ব্রেষ্ট ক্যান্সার এবং কোলন ক্যান্সারকে প্রতিরোধ করে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকলি, শালগমে আছে ইনডোল, যা ওভাররিয়ান এবং স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। পেঁয়াজ, রসুনে রয়েছে বিশেষ রাসায়নিক উপাদান, যা দেহের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ক্যান্সারের জন্য দায়ী কারসিনোজেনকে নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। আমিষভোজীদের চেয়ে নিরামিষভোজীদের রক্তে ন্যাচারাল কিলারসেল এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্টের মাত্রা ও কার্যকারিতা বেশী থাকে, যা সুস্বাস্থ্য রক্ষায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। শাক-সবজি যত বেশী গাঢ় রঙিন হবে তাতে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের পরিমাণও বেশী থাকবে। কচুশাক, পালংশাক, পুঁইশাক, পাটশাক, লেটুসপাতা, পুদিনাপাতা ইত্যাদি পাতাবহুল শাকে প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে, যেমন- লুটিন, ফলিক এসিড, বিটা ক্যারোটিন ইত্যাদি। খাবারে বেশী বেশী মাছ, মাংস থাকা স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর নয়। বিশেষ করে লাল গোশত বা রেডমিট বেশী খেলে রক্তে আয়রনের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই অতিরিক্ত আয়রন দেহের জন্য ক্ষতিকর।

বার্ধক্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে নিরামিষ খাবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শরীরের তরতাজা ভাব রক্ষা করা বা ত্বক ও চুলের সৌন্দর্য রক্ষা যাই বলি না কেন, তার বেশীরভাগ কৃতিত্ব কিন্তু বিভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেলস-এর। এই ভিটামিন ও মিনারেলসের উৎস হ'ল বিভিন্ন টাটকা শাক-সবজি ও ফলমূল। ভিটামিন-ই ও সি ত্বকের সিবাসিয়াম গ্রন্থির নিঃসরণের উপর প্রভাব ফেলে। এদের অভাব হ'লে এই গ্রন্থির ক্ষরণ কমে যায়। ফলে ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে। বয়সের ছাপ এসে পড়ে। সত্যি কথা বলতে কি, সয়াবিন সহ বিভিন্ন রঙিন শাক-সবজি ও ফলে পাওয়া যায় সর্বোপরি সামগ্রিক তারুণ্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেলস। সেজন্য খেতে হবে মৌসুমী ফলমূল এবং সময়ের সব রকমের শাক-সবজি। ছোট বাচ্চাদেরও নিরামিষ খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত।

নিরামিষ খাওয়ার গুণের শেষ নেই। ডায়াবেটিস রোগীর কিডনী, নার্ভ আর চোখ ঠিক রাখার জন্য নিরামিষ খাবার সাহায্যকারী বন্ধুর মত কাজ করে। দৈহিক ওযন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও নিরামিষের জুড়ি নেই। যারা হার্টের অসুখ বা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন তারা আপন করে নিন নিরামিষকে আর ভুলে যান চর্বিযুক্ত খাবার। নিরামিষভোজী হয়ে মুক্তি চান এসব সমস্যা থেকে। বেশী বেশী শাক-সবজি আর ফলমূল খাওয়ার ফলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ধীরগতিতে চলে। মানুষকে করে তোলে আরও সপ্রাণ, বোধশক্তিসম্পন্ন এবং আরো বেশী জীবনমুখী। সুতরাং সুস্থতায় নিরামিষের কোন বিকল্প নেই।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

ধানের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

বিচিত্র ধরনের পোকামাকড় দ্বারা ধান ফসল আক্রান্ত হ'তে পারে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১৭৫টি পোকা ধান ফসলের ক্ষতি করে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে ২০-৩০টি পোকা সচরাচর ধান ক্ষেতে দেখা যায় এবং এসব পোকা দ্বারাই ধানের বেশী ক্ষতি হয়ে থাকে। এসব ক্ষতিকারক পোকার মধ্যে মাজরা, পামরী, গান্ধি, বাদামি গাছ ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, ঘাস ফড়িং, উড়চুঙ্গা, পাতা মোড়ানো, পাতা মাছি, পলি মাছি, চুঙ্গি, ছাতারা, লেদা, শীষ কাটা লেদা ইত্যাদি পোকা অন্যতম। অবস্থা ও আবহাওয়া ভেদে এসব পোকার প্রতিটিরই মারাত্মক ক্ষতি করার প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা রয়েছে।

ক্ষতিকর মাজরা পোকা দমনে মরা ডগা দেখামাত্র টেনে তুলে ফেলতে হবে। পরিণত মথ এবং ডিমের গাদা সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। আলোর ফাঁদ পেতে মথ ধরে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষেতে মাঝে মাঝে বাঁশের মাথা পুঁতে পোকাখেকো উপকারী পাখি বসার জায়গা করে দিতে হবে। এছাড়া এ পোকা দমনে ১ হেক্টর জমিতে ডায়াজিনন ৬০ ইসি বা এজাতীয় ওষুধের যে কোন একটি ৪৫০ লিটার পানিতে ২-৩ কেজি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ধানের অপর একটি ক্ষতিকর পোকার নাম পামরী পোকা। এ পোকা পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় ছোট এবং কালো রঙের হয়ে থাকে। পোকার শরীরেও কাঁটা থাকে। এ পোকা দ্বারা কচি চারাগাছ বেশী আক্রান্ত হয়। পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলায় পাতায় সাদা দাগ তৈরী হয় এবং ক্লোরোফিলশূন্য কোষগুলো জালের মতো দেখায়। এতে গাছের সালোক সংশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত হয়। অধিক আক্রান্ত গাছ রোদে পোড়া অবস্থা ধারণ করে এবং শুকিয়ে খড়ের মতো দেখায়।

পামরী পোকা থেকে ফসল রক্ষা করতে হ'লে আক্রমণ দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছের পাতার অগ্রভাগ কেটে ফেলতে হবে। ডিম বা এর কীড়া সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। হাতজাল বা মশারির কাপড় দিয়ে পামরী পোকা ধরে কেরোসিনে ডুবিয়ে মারতে হবে। এ পোকা তাড়ানোর একটি সহজ উপায় হ'ল ১ ভাগ পানিতে ১ ভাগ কেরোসিন মিশিয়ে লম্বা দড়ি ভিজিয়ে গাছের উপর টানা দিতে হবে। এতে পোকা অন্যত্র চলে যায়। আলোর ফাঁদ পেতেও এ পোকা দমন করা যায়। রাসায়নিক দমনের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টর জমিতে সুমিথিয়ন ৫০ বা এজাতীয় কোন ওষুধের ১ লিটার পরিমাণ ৪৫০-৫০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ধানের প্রত্যাশিত উৎপাদন ব্যাহত করতে গান্ধি পোকাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ পোকা দেখতে সরু, লম্বা এবং বাদামি রঙের হয়ে থাকে। ধানের অপরিপক্ব দানা এ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে ধান চিটা হয়ে যায়। এছাড়া ধানের দুধ হওয়ার পর আক্রমণ হ'লে ধানের মান খারাপ হয় এবং চাল ভেঙ্গে যায়। এ পোকা দমনেও পরিণত পোকা ও ডিম সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। আক্রমণ বেশী হ'লে জমি থেকে ২০০-৩০০ মিটার দূরে আলোর ফাঁদ বসিয়ে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে এদের মেরে ফেলতে হবে। এছাড়া সুমিথিয়ন, ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পোকামাকড় ছাড়া নানা রকম রোগবালাই দ্বারাও ধানের মারাত্মক ক্ষতি হ'তে পারে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৩১টি রোগের কথা জানা গেছে। এর সবগুলো খুব বেশী ক্ষতিকর না হ'লেও কয়েকটি যথেষ্ট ক্ষতিকর। এসব ক্ষতিকর গুরুত্বপূর্ণ একটি রোগের নাম **'বাদামি দাগ'** রোগ। 'ড্রেসলিরা অরাইজি' নামক এক ধরনের ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগে আক্রান্ত হ'লে প্রথমে পাতার উপর ছোট ছোট বাদামি রঙের দাগ দেখা যায়। পরে আশপাশের দাগগুলো একত্রিত হয়ে বড় দাগের সৃষ্টি হয়। রোগের তীব্রতায় পাতা মরে যেতে পারে এবং কাণ্ড, শীষ ও বীজে বাদামি দাগ দেখা দেয়। খাওয়ার সময় আমরা যে মরা কালো ভাত দেখতে পাই তা এ রোগে আক্রান্ত চাল থেকে হয়।

ধানের অপর একটি ক্ষতিকারক রোগ হ'ল উফরা রোগ। 'ডিটাইলেনকাস এনগাসটাস' নামক এক ধরনের কৃমি দ্বারা এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে কাণ্ডের অগ্রভাগের পাতা ও কাণ্ড বিবর্ণ হয়ে যায়। কচি পাতাসহ থোড় কুঁকড়িয়ে যায়। শীষ অর্ধেক বা পুরো বের হয়। তবে চিটার পরিমাণ বেড়ে যায়। এছাড়া **টুংরো** রোগ দ্বারাও ধানগাছ আক্রান্ত হ'তে পারে। এক ধরনের বীজবাহিত ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। গাছের চারা অবস্থা থেকে সব পর্যায়েই এ রোগ হ'তে পারে। আক্রমণের প্রথমে পাতার রং হালকা সবুজ হয়। পরে পুরো পাতা হলুদ হয়ে যায়। এতে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। কুষিও বের হয় না। গাছ টান দিলে সহজেই উঠে আসে।

ধানের এসব রোগ ফলন অনেক কমিয়ে দিতে পারে। তাই এগুলোর প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে নীরোগ বীজ ব্যবহার করতে হবে। শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে এবং রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করতে হবে। রোপণের আগে বীজ শোধন করতে হবে। আক্রান্ত জমির পানি নিষ্কাশন করে মাটি শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া ছত্রাকজনিত বাদামি দাগ রোগের ক্ষেত্রে ছত্রাকনাশক ওষুধ ডাইথেন এম-৪৫ জমিতে স্প্রে করতে হবে।

উফরা রোগের ক্ষেত্রে প্রতি একরে ১০ কেজি ফুরাডান অথবা ২ কেজি বেনলেট কুষি বের হওয়ার শেষ অবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে। আর সবুজ পাতা ফড়িং যেহেতু টুংরো রোগের বাহক তাই হাতজাল বা আলোর ফাঁদে এদের ধরে ধ্বংস করতে হবে। প্রয়োজনে কীটনাশক ছিটিয়ে এ পোকা দমন করতে হবে। ধান ফসলে এসব পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যমে একদিকে বাড়বে ফলন, অন্যদিকে হাসবে কৃষক। কাজেই সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে ধান ফসলের প্রতি যত্নশীল হওয়া আবশ্যক।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

আল্লাহ্‌র সৈনিক

- মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

দুর্বার বেগে ধেয়ে যায় কারা দুরন্ত নির্ভীক
তাওহীদবাণী কণ্ঠে ওদের আল্লাহ্‌র সৈনিক।
মুছে দেবে ওরা জাহলিয়াতের ঘুমন্ত যুলমাত
দুঃসহ জ্বালা পাড়ি দিয়ে পাবে শান্তির মুলাকাত।
দূরে দেবে ওরা শাসন ত্রাসন শোষিতের নেবে সাথ
বিশ্বের পরে আনবে ওরা স্বর্গীয় সওগাত।
বিদ্রোহীর
গড়বে শিবির
সকল বাধা ছিন্ন করে
দ্বীন ইসলামের বাজাবে ডংকা
মুসলিম এক সাথ।
ধুলির ধরণী ধন্য হবে
বন্দীর মুখে কত উল্লাসে আবার ফুটিবে হাসি
সোনার স্বর্গ মর্তে আসিবে
পবিত্রতার বাঁধনে আবার জড়াবে জগদ্বাসী।
***

التحريك হ’ল আন্দোলন

- শিহাবুদ্দীন আহমাদ
কালাইহাটা, গাবতলী, বগুড়া।

تَبْلِيْغٌ প্রচার تَجْدِيْدٌ সংস্কার
বিকল্প যার নাই।
تَنْظِيْمٌ সংগঠন تَرْبِيْةٌ প্রশিক্ষণ
সংঘবদ্ধতা চাই॥
أَهْلٌ ওয়ালা حَدِيْثٌ বলা
কুরআনের অনুসারী যারা।
اِتِّبَاعٌ অনুসরণ اِطَاعَةٌ অনুকরণ
ছহীহ হাদীছ মানে তারা॥
دَعْوَةٌ আহ্বান جِهَادٌ বন্তপ্রাণ
দ্বীনের কাজে দাঈ সাজি।
آخِرَةٌ পরকাল قِيَامَةٌ ধ্বংসকাল
জান-মাল ব্যয়ে হই রাযী॥
وَحْدَةٌ একতা تَصْدِيْقٌ সত্যতা
মৌলিক দু’টি গুণ।
اِعْتِصَامٌ আঁকড়ে ধরা اِنْتِظَامٌ ব্যবস্থা করা
ঐক্যের করি পণ॥
حَدِيْثٌ আল-কুরআন حَدِيْثٌ নবীর বয়ান
কুরআন-হাদীছে প্রমাণ রয়।
قُبُوْلٌ গ্রহণ করা اِنْعِقَادٌ বাস্তবায়ন করা
পরকালে তাদেরই হবে জয়॥
اِجْتِهَادٌ গবেষণা تَقْلِيْدٌ অন্ধভাবে মানা
প্রয়োগ করা উচিত বিবেক।
شِرْكٌ আল্লাহ্‌র অংশীদারী بِدْعَةٌ নতুন সৃষ্টি।
ধ্বংস করে না যেন আবেগ॥
حَرَكَةٌ দোলন تَحْرِيْكٌ আন্দোলন
সদা কর্মে জাগে সক্ষমতা।
كَسْلاَن অলসতা فَسْلاَن বিফলতা
দূরে ঠেলতে হবে সব দুর্বলতা॥
جَنَّةٌ স্বর্গ جَهَنَّم নরক
কর্মে হবে প্রভেদ ঠাই।
صَحِيْحٌ বিশুদ্ধ خَطَاءٌ অশুদ্ধ
সদা কর্মে স্বচ্ছতা থাকা চাই॥
***

শাসন নামে শোষণ

- মুহাম্মাদ আবুল কাশেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

শাসন নামে শোষণ করে
করে শুধুই অত্যাচার,
দুঃখ যাদের নিত্যসাথী
তাদের শুধু হয় বিচার।
নিষ্কলংক মানুষগুলো
হতাশায় দিন গুনছে,
চক্রকারীর চক্রজালে
তবুও তারাই ভুগছে।
ক্যাডার ভিত্তিক রাজার নীতি
গড়ছে ভবে যারাই,
লুটতরাজি, চাঁদাবাজী
জন্ম দিচ্ছে তারাই।
মানবরূপী দানবগুলো
বসে আসন জুড়ে,
ময়না শেষে খোল পিটিয়ে
খাচ্ছে মগজ কুরে।
আমরাতো নই স্বৈরাচারী
নইতো চাঁদাবাজ,
দ্বীন কায়েমের নির্ভিক সেনা
গড়তে আল্লাহ্‌র রাজ।
জগৎ জুড়ে রয়েছে মোদের
সুখ্যাতি সম্মান,
লক্ষ প্রাণের মুক্ত আশা
আহলেহাদীছ নাম।
তবুও কেন জেলখানাতে
মহান নেতা গালিব ভাই,
চাইলে রক্ত আরো দেব
বিনিময়ে তাঁর মুক্তি চাই।
***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তর

১। হাওয়াই দ্বীপ ও আইসল্যান্ড।
২। জর্ডান নদী।
৩। পেরুতে।
৪। ভারখায়ানাস্ক (রাশিয়া)।
৫। আযীযিয়া (লিবিয়া)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তর

১। ড্রাগন, স্কুইড ও স্টার নামক মাছের দেহে।
২। জেফারসন, মেক্সিকো উপসাগরে অবস্থিত।
৩। মিথেন গ্যাস।
৪। একটি প্রসিদ্ধ বৃহৎ হীরক খণ্ড।
৫। ইলেক্ট্রনিক্স মস্তিষ্ক।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১। উদ্যানের শহর কোন্‌টি?
২। ক্যাঙ্গারুর দেশ কোন্‌টি?
৩। চিরশান্তির শহর কোন্‌টি?
৪। সূর্যোদয়ের দেশ কোন্‌টি?
৫। দ্বীপের নগরী কোন্‌টি?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। টেলিভিশন কি?
২। বেতার কি?
৩। থার্মোমিটার কি?
৪। ব্যারোমিটার কি?
৫। টেলিস্কোপ কি?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

বাগমারা, রাজশাহী ১৭ মার্চ শনিবারঃ অদ্য বাদ ফজর সমসপুর হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। তিনি সোনামণিদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গঠন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মীযানুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি নাজমুল হক্ব এবং জাগরণী পরিবেশন করে হাবীবুর রহমান।

আহলেহাদীছ আন্দোলন

- মুহাম্মাদ মুছতফা কামাল
কাকডাংগা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আহলেহাদীছ আন্দোলন
থাকবে টিকে আজীবন,
আহলেহাদীছ আন্দোলন
বোঝে যারা জ্ঞানী জন,
আহলেহাদীছ আন্দোলন
নির্ভেজাল এক সংগঠন,
আহলেহাদীছ আন্দোলন
জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটন
আহলেহাদীছ আন্দোলন
জঙ্গীবাদকে করে না সমর্থন
***

সুন্দর ভুবন

- মুহাম্মাদ সাজ্জাদ হোসাইন
কোর্টপাড়া, ঝিনাইদহ।

সুন্দর এই ভুবনে
মোরা চাই বাঁচতে
দ্বীনের পথে যেন মোরা
সদা পারি চলতে,
সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ
তুমি কতই মহান,
সৃষ্টি করেছ সুন্দর করে
এই সারা জাহান।
আল্লাহ্‌র রহমতে
মোরা আছি সবাই ডুবে।
থাকে যেন তাওহীদের কালেমা
মোদের মুখে মুখে,
মোরা আছি অতি সুখে
সুন্দর ত্রিভুবনে।
জীবন যেন যায় চলে
তোমারই পথে থেকে।
***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধিঃ ব্যাপক প্রভাব

জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপক প্রভাব পড়ছে জনজীবনে। এমনিতেই বর্তমানে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জনজীবন বিপর্যস্ত। এরই মধ্যে জ্বালানী তেলের এতটা মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে ফেলেছে চরম ভোগান্তির মধ্যে। বেড়ে গেছে বাড়ী ভাড়া, গাড়ী ভাড়া, বাজার খরচ, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন খরচ, পরিবহন খরচ। সবকিছু মিলিয়ে আরেক দফা মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় জনসাধারণের এখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। হঠাৎ করে প্রায় ১৬ শতাংশের উপর জ্বালানী তেলের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষির উৎপাদন, ব্যাহত হচ্ছে শিল্পের উৎপাদন। সর্বোপরি এ মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে সারাদেশেই জনজীবনে ঘটছে বিপত্তি। জ্বালানী তেলের সাথে কৃষি শিল্পসহ সবখাতের উৎপাদন ও সরবরাহ সম্পৃক্ত। স্বাভাবিকভাবেই তেলের মূল্য বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে সব পণ্যের দামও আরেক দফা বেড়েছে। সার্বিকভাবে জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রে ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় বৃদ্ধি পাচ্ছে মূল্যস্ফীতির হার। কৃষিতে সরাসরি সেচের উৎপাদন খরচই বেড়েছে প্রায় ২২ শতাংশ। পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় সার ও কীটনাশকের মূল্যও বেড়েছে।

জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে পরিবহন সেক্টরেও বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে সর্বাগ্রে। ডিজেলের দাম বেড়েছে ২২ শতাংশ ও পেট্রোলের দাম বেড়েছে ১৬ শতাংশ। কিন্তু ভাড়া বাড়ানো হয়েছে ২৫ শতাংশের উপরে। বাসভাড়া জনপ্রতি ৭ পয়সা এবং পণ্যবাহী ট্রাকভাড়া টনপ্রতি ২৩ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হ'লেও বাস্তবে তার চেয়ে অনেক বেশী ভাড়া আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

একলাফে জ্বালানী তেলের মূল্য লিটার প্রতি গড়ে ৯ টাকা বেড়ে যাওয়ায় বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্টরা আশংকা করছেন যে, এতে করে অর্থনীতির সূচক নিম্নমুখী হবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাবে। উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় রফতানী বাণিজ্যে নিম্নমুখী প্রভাব পড়ারও আশংকা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য ক্ষতির কারণ হবে বলে বিবেচিত হচ্ছে।

মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশের জন্য বড় উদ্বেগের বিষয়

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ভাল। কিন্তু এ মুহূর্তে বড় উদ্বেগের কারণ হচ্ছে মূল্যস্ফীতি। গত ১৮ এপ্রিল '০৭ ইউএনএসকেপ প্রকাশিত 'এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমীক্ষা' শীর্ষক রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের উচ্চমূল্য এবং পোশাক শিল্পে মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্ট (এমএফএ) কোটা উঠে যাওয়ার পরও বাংলাদেশ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৬ দশমিক ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। কিন্তু ভোগ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য প্রকৃত উদ্বেগের কারণ। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার ৭ দশমিক ২ শতাংশে পৌঁছেছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে আর্থিক সমন্বয় বিশেষ করে রাজস্ব আদায় বাড়ানোর বিষয়টি এখনও বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে আরো বলা হয়েছে, বাংলাদেশসহ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে এখনো বিপুল সংখ্যক মহিলা শ্রম বাজারে আসতে পারছে না। এর ফলে প্রতিবছর এ অঞ্চলে ৪২ থেকে ৪৭ বিলিয়ন ডলারের লোকসান হচ্ছে। রিপোর্টে দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সঠিক সংস্কারের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ থেকে ৫টি ক্যাটাগরিতে পণ্য আমদানি করবে

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ থেকে ৫টি ক্যাটাগরীতে অধিকহারে পণ্য আমদানি করবে। ইউ-এশিয়া বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিতে এশিয়ায় বিনিয়োগ কর্মসূচির আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ সকল পণ্য আমদানি করবে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম চেম্বার এবং জার্মান ভিত্তিক সংগঠন সেকিউএ যৌথভাবে এ কর্মসূচী চালু করেছে। এই কর্মসূচীর আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত পণ্য এবং উপহার সামগ্রী ও হ্যান্ডিক্রাফটস জাতীয় পণ্য আমদানি করবে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম চেম্বারভুক্ত ৫০টি কোম্পানী থেকে এসব পণ্য আমদানী করা হবে। এ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হ'ল ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করা।

১৭টি শিল্প কারখানা বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে

অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে গত ১৭ এপ্রিল ১৭টি সরকারী শিল্প কারখানা বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়ার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১২টি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের এবং ৫টি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত। এগুলো হচ্ছে- রাঙামাটি টেক্সটাইল মিলস

লিঃ, চিত্তরঞ্জন কটন মিলস লিঃ নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল কটন মিলস লিঃ, মাগুরা টেক্সটাইল মিলস লিঃ, মনোয়ারা জুট মিলস লিঃ সিদ্ধিরগঞ্জ দৌলতপুর জুটমিলস লিঃ খুলনা, কওমী জুট মিলস লিঃ সিরাজগঞ্জ, সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, হ্যাণ্ডলুম সার্ভিস সেন্টার নরসিংদী, টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার নোয়াখালী, রাজশাহী রেশম কারখানা, ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানা এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের ঢাকা লেদার কোম্পানী লিঃ সাভার, নর্থবেঙ্গল পেপার মিলস পাবনা, চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স, কর্ণফুলী রেয়ন এন্ড কেমিক্যাল লিঃ কাপ্তাই ও বাংলাদেশ ক্যান কোম্পানী লিঃ চট্টগ্রাম। আগামী ৪ মাসের মধ্যে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন এগুলো টেন্ডারের মাধ্যমে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করবে। উল্লেখ্য, উক্ত সভায় মোট ৪৮টি সরকারী শিল্প কারখানা বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। তার মধ্যে ১৭টি শিল্পকারখানা বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাকী শিল্প কারখানাগুলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে শিগগিরই ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

৫৮টি কারাগারে ৫১১ জন শিশু বন্দি

দেশের ৫৮টি কারাগারে বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট ৫১১ জন শিশু বন্দি রয়েছে। এসব কারাগারে শিশুরা অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছে। দেশে মাত্র তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র থাকলেও সেখানেও শিশু কারাবন্দিদের সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। খুলনার বেসরকারী সংগঠন 'জাগ্রত যুবসংঘ' (জেজেএস)-এর এক মনিটরিং রিপোর্টে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়। জেজেএস'র রিপোর্টে বলা হয় মার্চ'০৭ পর্যন্ত দেশের ৫৮ যেলার ৫৮টি কারাগারে ৫১১ জন শিশু বন্দি রয়েছে। এর মধ্যে ৪৭১টি ছেলে এবং ৪০টি মেয়ে শিশু। এর মধ্যে খুলনা বিভাগের আওতাধীন ঐসব কারাগারগুলিতে মোট বন্দি রয়েছে ১৮ জন শিশু। বরিশাল বিভাগের ৬টি কারাগারে ২৫ জন শিশু বন্দি রয়েছে। সিলেট বিভাগের ৪টি কারাগারে ৫৪ জন শিশু বন্দি রয়েছে। ঢাকা বিভাগের ১৭টি কারাগারে শিশু বন্দির সংখ্যা ১৬৪ জন। চট্টগ্রাম বিভাগের আওতাধীন ৯টি কারাগারে ১৮৫ জন শিশু বন্দি রয়েছে। রাজশাহী বিভাগের ১৪টি কারাগারে শিশু বন্দির সংখ্যা ৬৫। এসব শিশুদের বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খুলনার জেজেএস, ঢাকার বিআরপিওডব্লিউএ, উন্নয়ন সংস্থা চট্টগ্রাম সিওডিইসি, এফআইভিডিবি, রাজশাহীতে সিডিএসহ বেশ কয়েকটি সংগঠন কাজ করছে।

টেলিযোগাযোগ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনায় বাংলাদেশ শীর্ষে

টেলিযোগাযোগ প্রবৃদ্ধির দিক থেকে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানে রয়েছে। কয়েকটি খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একটি টেলিকম সংস্থা পরিচালিত আন্তর্জাতিক গবেষণায় এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে। রিপোর্ট মতে, বাংলাদেশের পরই রয়েছে চীন ও ভারতের নাম। অপরদিকে সবচেয়ে কম সম্ভাবনার দেশ হচ্ছে ইউরোপের ইস্তোনিয়া। ইঙ্গ-রাশিয়ান টেলিকম বিনিয়োগ গোষ্ঠী 'আলটিমো' পরিচালিত গবেষণায় এই চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেছে। গবেষণার ফলাফল নিয়ে টেলিকম টিভির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বাজার হিসাবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। এরপরই রয়েছে যথাক্রমে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং রাশিয়ার নাম। অপরদিকে সবচেয়ে কম সম্ভাবনাময় পাঁচটি দেশ হ'ল ইস্তোনিয়া, ইসরাঈল, আয়ারল্যান্ড, তাঞ্জানিয়া এবং নাইজিরিয়া।

উল্লেখ্য, মোবাইল ও ল্যান্ড ফোন মিলে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় সোয়া দুই কোটি গ্রাহক রয়েছে। দেশে বর্তমান সরকার নিয়ন্ত্রিত টেলিফোন সংস্থা ছাড়াও ৫টি মোবাইল কোম্পানি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া ১৫টির মতো বেসরকারি ল্যান্ডফোন কোম্পানি সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স পেয়েছে।

প্রতিবছর তাপমাত্রা বাড়ছে ০.০১৬৪ ডিগ্রী

ক্ষতির সম্মুখীন হবে দেশের কৃষি ব্যবস্থা

প্রতিবছর দেশে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা ০.০১৬৪ D^oc। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এর বার্ষিক গড় ছিল দশমিক ০১৬৪ D^oc। ১৯৭১ সাল হ'তে ২০০০ সাল পর্যন্ত এর বার্ষিক গড় ছিল দশমিক ০০৭৩ D^oc। আবহাওয়া অধিদফতরের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, গত শতকের মত এমন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকলে চলতি শতকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৯ থেকে ৮৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বেড়ে যাবে। যা দেশের পরিবেশ বিপর্যয় ঘটাবে। কৃষি বৈচিত্রে প্রভাব পড়বে সবচেয়ে বেশী এবং এর সাথে সাথে বাড়বে লবণাক্ততা। বৈশিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ধারায় দেশে এমন প্রভাব পড়তে পারে। আগামী ৫০ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়তে পারে ১ দশমিক ১ থেকে ৬ দশমিক ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে দেশের মোট আয়তনের ২২ হাযার ৮৮৯ বর্গ কি.মি. তলিয়ে যেতে পারে। এর ফলে প্রায় তিন হাযার মিলিয়ন হেক্টর উর্বর জমি পানির তলে তলিয়ে যাবে। এতে ২শ' মিলিয়ন টন ধান সহ গম, আখ, পাট, মটর প্রভৃতির উৎপাদন কমে যাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ নদীগুলোতে পানি বৃদ্ধি পাবে। বন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এতে মোট ভূ-খণ্ডের ২০ শতাংশ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। লবণাক্ততা বৃদ্ধি দেশের ৩২ শতাংশ ভূমিকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এজন্য কোন উদ্বেগ নয়, বরং নিতে হবে সর্তকতা।

বিষাক্ত কীটনাশকের প্রভাবে বছরে ৫ সহস্রাধিক লোকের মৃত্যু হয়

বেসরকারী একটি সংস্থা কর্তৃক উত্তর বঙ্গের ক্ষতিকর কীটনাশকের ভয়াবহতা তুলে ধরে বলা হয়, আখ, লালশাক, পটলসহ বিভিন্ন শাক-সবজিতে যেভাবে হেপ্টাক্লোর ব্যবহার হচ্ছে তাতে শুধু কীট-পতঙ্গ বা পশুপাখি মারা যাচ্ছে না, মানুষও মারা যাচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, কৃষিতে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক ও কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাবেই হুমকির মুখে উদ্ভিদ, মৎস ও পক্ষীকুল। বিলীন হচ্ছে লতাগুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। দূষিত হচ্ছে মাটি, পানি, পরিবেশ ও খাদ্যচক্র। বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে আমাশয়, জন্ডিস ও ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস উপসর্গ দেখা দিচ্ছে, হারিয়ে ফেলছে প্রজনন ক্ষমতা। জানা যায়, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে এ জাতীয় রাসায়নিকের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শিকারী পাখি ডুবুরী, বড় জলচর পাখী, ফ্যালকন ও ঈগলের সংখ্যা আশাতীতভাবে কমে গেছে। বর্তমানে দেশে অবাধে চলছে ক্ষতিকর কীটনাশকের (দীর্ঘস্থায়ী জৈবদূষক) ব্যবহার। এসব জৈব ক্লোরিন জাতীয় কীটনাশক মাটিতে সবচেয়ে বেশী সময় অবস্থান করে এবং এগুলো স্থানান্তরিত হয় ও খাদ্যচক্রে সংযোজিত হয়। দেশে প্রতিবছর ৫ হাযার মৃত্যুর ঘটনা ঘটে কীটনাশকজনিত বিষক্রিযার প্রভাবে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর বিশ্বে ৩০ লাখ লোক কীটনাশক জনিত কারণে অসুস্থ হচ্ছে এবং প্রায় ২০ হাযার লোক মারা যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ২ লাখ লোক কীটনাশক পানে আত্মহত্যা করছে। জাতিসংঘ থেকে প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায়, বিশ্বে প্রতি মিনিটে চারটি কীটনাশক জনিত বিষাক্ততার ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ৫০ শতাংশই ঘটে উন্নয়নশীল দেশে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন জানিয়েছে, ১২টি বিষাক্ত পদার্থের মধ্যে ৯টি কীটনাশক বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারের তেলও অনেক রেস্টুরেন্টে ভাজাপোড়া তৈরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিদেশ

বিশ্ববাসী আমেরিকাকে বিশ্বাস করে না

পৃথিবীর প্রায় সাড়ে তিনশ' কোটি বা ৫৬ শতাংশ মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বাস করে না। তারা যুক্তরাষ্ট্রকে বৈরী ভাবে। তারা মনে করে, যুক্তরাষ্ট্র নিজেই পৃথিবীর শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারীর অর্থাৎ পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লেও এ দায়িত্ব পালন না করে সে উল্টো কাজ করছে। বিশ্বের একক পরাশক্তিটিকে আধিপত্যবাদী এবং অবৈধ হস্তক্ষেপকারী হিসাবে দেখে তারা। যুক্তরাষ্ট্রের কথায় ও কাজে মিল নেই। শান্তি-শৃংখলা রক্ষার কথা বলে সে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ কাজে হস্তক্ষেপ করে। সে রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অপরের সম্পদ লুট করে নিজের এবং তার মিত্রদের ব্যবসা ও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। জর্জ ডব্লিউ বুশের ইরাকনীতি সম্পূর্ণ ভুল এবং তিনি মিথ্যা কথা বলে ২০০৩ সালে তেলসমৃদ্ধ উপসাগরীয় দেশটির বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালান। শিকাগো ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক জরিপ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রভাবশালী এবং জনবহুল ১৮টি দেশে জরিপ পরিচালনা করে এ তথ্য দেয়।

জরিপে আরো বলা হয়, ইরাক যুদ্ধের কারণে ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধদেহী মনোভাবে বিশ্ববাসী দারুন উদ্বিগ্ন। আঞ্চলিক বিরোধ এবং বিশ্বের সমস্যা সমূহ যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে মোকাবিলা করছে তাতে তারা মোটেও সন্তুষ্ট নয়। প্রতি চারজন আমেরিকাদের মধ্যে ৩ জন বা ৭৩ শতাংশ মনে করে যে, বিশ্বে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছে। উল্লেখ্য, গত ১ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, ফ্রান্স, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ইউক্রেন, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, ফিলিস্তীন ভূ-খণ্ড সমূহ, অষ্ট্রেলিয়া, আর্মেনিয়া, পেরু, ইরান ও ইসরাঈলের ১০ লক্ষাধিক লোকের উপর এই জরিপ চালানো হয়।

অন্ধ পাইলটের অর্ধ পৃথিবী ভ্রমণ

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এক ব্রিটিশ পাইলট মাইক্রোলাইট বিমান চালিয়ে পৃথিবীর অর্ধেক ভ্রমণের রেকর্ড গড়েছেন। মাইলস হিলটন বারবার নামের ৫৮ বছর বয়সী এ ব্রিটিশ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পাইলট গত ৭ মার্চ লন্ডন থেকে যাত্রা করে ২১ হাযার কিলোমিটার উড়াল শেষে গত ৩০ এপ্রিল সোমবার সিডনী ব্যাংকসটাউন বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অন্ধত্ব মোকাবিলায় তহবিল সংগ্রহে তিনি এ বিমান ভ্রমণ করেন। হিলটন বারবার একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন সহকারী পাইলটের সহযোগিতায় বিমান চালালেও তিনি প্রধানত একটি ওয়ারলেস কিবোর্ড এবং নেভিগেশন ইনস্ট্রুমেন্টের শাব্দিক নির্দেশনার উপর নির্ভর করেন। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে অন্ধত্ব বয়ে চলা এই পাইলট

Contents

আশা করেন, এই ভ্রমণ থেকে তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নিরাময়যোগ্য অন্ধত্ব মোকাবিলায় প্রায় ২০ লাখ মার্কিন ডলার তহবিল সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। হিলটন বারবার ১৯৯৯ সালে সাহারা মরুভূমিতে ২শ' ৫০ মিলোমিটার 'টাফেস্ট ফুট রেস অন আর্থ' সম্পন্ন করেন। তিনি আফ্রিকা ও ইউরোপের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কিলিমাঞ্জারো ও মাউন্ট ব্যাংক আরোহণ করেন।

মার্কিন কোম্পানীগুলো বিশ্বের পরিবেশ দূষিত করছে

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এই প্রথমবারের মত বিশ্ব আবহাওয়া পরিবর্তন নিয়ে ১৭ এপ্রিল'০৭ নিউইয়র্কে এক বিতর্ক আলোচনা শুরু করেছে। তার আগের দিন ১৬ এপ্রিল পরিষদের সদস্য দেশের রাষ্ট্রদূতগণ আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণ এবং এর প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তারা বলেন, ডুপন্টের সি এমসি উৎপাদনকারী বৃহৎ মার্কিন কোম্পানীগুলো বিশ্বে পরিবেশ দূষিত করছে। গ্রীন হাউজ গ্যাস, বন-বনানী উজাড়, নির্বিচারে নদী ও জলাশয় ভরাট করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে অপরিকল্পিত নগরায়ণকে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হবার প্রধান কারণ হিসাবে তারা উল্লেখ করেন। মূলত একারণে পৃথিবী দিনে দিনে উত্তপ্ত হচ্ছে এবং আবহাওয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। তারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ডুপন্ট কোম্পানীর মত সি এমসি গ্যাস উৎপাদনকারী বৃহৎ শিল্পকারখানাগুলো বায়ুমণ্ডলে ৯০ শতাংশ বিষাক্ত গ্যাস নির্গত করছে। ফলে বায়ুমণ্ডলের ওযন স্তর মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

মার্কিন কর্তৃত্বের কারণে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন

বুশ সমর্থিত প্রধান পল উল্ফভিৎসের বাড়াবাড়ি ও নারীঘটিত কেলেংকারির জন্য বিশ্বব্যাংকের স্টাফরা যখন তার পদত্যাগের দাবীতে সোচ্চার তখন আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে (আইএমএফ) যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের একচ্ছত্র আধিপত্য কমিয়ে চীনসহ দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির দেশগুলোর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চাপ দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির অধিকাংশ সদস্য। গত ১৩ এপ্রিল ওয়াশিংটনে জি-৭-এর মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল আইএমএফ-এর সংস্কার কর্মসূচী। গত ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে সিঙ্গাপুরে আইএমএফ-এর বার্ষিক সম্মেলনে ঐ কর্মসূচী অনুমোদন করা হয়েছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের 'ধরিমাছ না ছুঁই পানি' নীতির কারণে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। মার্কিন নীতি সংস্কার বাস্তবায়নের পথে মূল প্রতিবন্ধক বলে বেশীরভাগ সদস্য রাষ্ট্রের বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোগ। এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইএমএফ-এর অল্প আয়ের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। একই দিন ওয়াশিংটনে আইএমএফ-এর সম্মেলন শুরু হয়। এতে স্টিয়ারিং কমিটির ১৮৫ সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। কমিটির সদস্যরা বলেন, যে উদ্দেশ্যে আইএমএফ-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি তা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তারা স্রেফ রাজনৈতিক বিষয় বাদ দিয়ে আইএমএফ-কে সঙ্গত এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মনোযোগ দিতে বলেন। এক বছর ধরে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় প্রথম পর্যায়ের সংস্কার সাধন করা যায়নি। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কমাতে হবে। অন্যথা ৬২ বছরের প্রতিষ্ঠানটি টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে বলে তারা সতর্ক করে দেন।

চীনে 'নারীস্থান' শহর নির্মাণ হচ্ছে

চীনের পর্যটন কর্তৃপক্ষ বিশ্বের প্রথম 'মহিলা' শহর গড়ে তোলার এক অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারী কর্মকর্তারা জানান, এই শহরে অবাধ্যতার জন্য পুরুষরা শাস্তি পাবে। একজন পর্যটন কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বলেন, চীনের চংকিং পৌর এলাকায় হুয়াং কিয়াও যেলার ২৩ বর্গ কিলোমিটার দীর্ঘ লং সইহু গ্রামে স্থানীয় ঐতিহ্য 'মহিলা হুকুম করবে পুরুষরা মেনে চলবে' এই রীতির ভিত্তিতে 'মহিলা শহরটি' গড়ে তোলা হবে। কর্মকর্তা সুনামি লি টেলিফোনে সাংবাদিকদের বলেন, 'সিচুয়ান প্রদেশ ও চংকিং এলাকায় মহিলাদের প্রাধান্য আর পুরুষদের মেনে চলার রীতি প্রচলিত। সেই রীতি অনুসরণ করেই আমরা পর্যটকদের আকৃষ্ট করা এবং পর্যটনের উন্নয়নের জন্য ব্যাপারটাকে কাজে লাগাচ্ছি। লি বলেন, 'পর্যটন ব্যুরো ২০ কোটি ইউয়ান থেকে ৩০ কোটি ইয়ান এই অবকাঠামো, সড়ক ও ভবন নির্মাণে ব্যয় করবে। তিনি আরো বলেন, এই পরিকল্পনায় অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য আমরা দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশী অস্ত্র রয়েছে মার্কিনীদের কাছে

২০০৬ সালে বিশ্বের ৯টি উন্নত দেশে বন্দুকের গুলীতে ৩৪,৪৩৭ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী মারা গেছে আমেরিকায়। এ সংখ্যা হচ্ছে ২৯,৬৪৫ এবং দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে ফ্রান্স ২,৯৬৪ জন। বিশ্ববিখ্যাত নিউজ উইকের ৩০ এপ্রিল সংখ্যায় বিশ্বব্যাপী আগ্নেয়াস্ত্র পরিস্থিতির আলোকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জনসংখ্যানুপাতে আমেরিকায় প্রতি লাখে ১০.০৮ জন খুন হয়েছে বন্দুকের গুলীতে। দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে সুইজারল্যান্ড ৬.৪০%। সুইজারল্যান্ডে খুন হয়েছে ৪৫৯ জন। উল্লেখ্য, আমেরিকায় মোট আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে শতকরা ৯০ জনের কাছে। এ সংখ্যা হচ্ছে ২৭ কোটি। এ হিসাব শুধু বেসামরিক লোকের নিকট মওজুদ অস্ত্রের। ইয়েমেনে রয়েছে ৬১%-এর কাছে অর্থাৎ ১ কোটি ১৫ লাখ মানুষের কাছে। ফিনল্যান্ডে রয়েছে ৯৯ লাখ ৫০ হাযার লোকের কাছে, সুইডেনে ৩১%-এর কাছে ২৮ লাখ, অস্ট্রিয়ায় ৩১%-এর কাছে ২৫ লাখ এবং জার্মানীতে ৩০%-এর কাছে ২ কোটি ৫০ লাখ। বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় অস্ত্রের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে একে সিরিজ। এর সংখ্যা ৭ কোটি থেকে ১০ কোটি। দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে রাশিয়ার তৈরী ম্যাকারভ ৯ মিলিমিটারের পিস্তল ২ কোটি, তৃতীয় শীর্ষে এম-১৬ সিরিজ ১ কোটি ২০ লাখ এবং চতুর্থ স্থানে জি-থ্রি ৭০ লাখ। অস্ট্রিয়ার তৈরী গ্লক ৯ মিলিমিটারের পিস্তল ২৫ লাখ এবং বেলজিয়ামের তৈরী এফএন ৯ মিলিমিটারের রিভলবার ১৩ লাখ সর্বসাধারণের হাতে রয়েছে।

উন্নত তথা শিল্পোন্নত বিশ্বে বন্দুকের গুলীতে সবচেয়ে কম মানুষ খুন হচ্ছে জাপানে প্রতি লাখে ০.০৮ জন, যুক্তরাজ্যে ০.৩১, স্পেনে ০.৭৫, পোল্যান্ডে ০.৪৪ জন।

মুসলিম জাহান

মিথ্যা ইসলামভীতি দূর করতে মিডিয়ার সহযোগিতা প্রয়োজন

-ওআইসি মহাসচিব

পশ্চিমা বিশ্ব সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মানুষকে ও তাদের ধর্মমতকে নানাভাবে ক্ষতবিক্ষত করতে চায়। কোথাও কোথাও তারা সাময়িক সাফল্য লাভও করেছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অসত্য প্রচারণার মূলে কাজ করে পশ্চিমা বিশ্বের উন্নত মিডিয়াগুলো। মুসলমান দেশগুলো মিডিয়ায় ইতিবাচক প্রচারণার সুযোগ পেলে তারাও ইসলামী সৌন্দর্যের বিষয়গুলোর সত্যতা প্রকাশ করতে পারতো। এই বিষয়ে ওআইসি মহাসচিব প্রফেসর একমেলুদ্দীন ইহসানোগ্লু আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত 'মিডিয়ার ভূমিকা' নামের তিন দিনের এক সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে গত ২৬ এপ্রিল বলেছেন, ইসলামকে নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর যে বিরূপ প্রচারণা চালাচ্ছে তার মোকাবিলা করতে পারে ইসলামী সংস্থার সদস্য দেশগুলো তাদের মিডিয়ার মাধ্যমে। তিনি আরো বলেন, মানবতা, সহিষ্ণুতা ও শান্তিপূর্ণ ভৌগলিক অবস্থান এবং সেসব বিষয়ে গঠনমূলক প্রচারণার মাধ্যমেই কেবল মিথ্যা ইসলামভীতি দূর করা যায়। তিনি আরো বলেন, খুব দ্রুততার সাথে মুসলিম পণ্ডিত ও আলেম সমাজকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে এবং তারা যদি নিজেদের মধ্যে ইসলামের বিভিন্ন কল্যাণকর নিয়ম-নীতির কথা আলোচনা করতে মিলিত হন এবং মিডিয়ায় সেসব প্রচারিত হয় তাহ'লে মিথ্যা ইসলামভীতি দূর করা সম্ভব হবে।

ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কখনো বিজয়ী হ'তে পারবে না

আমেরিকার জনগণ বলছে, ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কখনো বিজয়ী হ'তে পারবে না। এ কথা ইতিপূর্বে সে দেশের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কংগ্রেস সদস্যরা বার বার বলে আসছেন। প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকে এমন একটি গ্যাঁড়াকলে আটকে পড়েছেন যে তা থেকে তিনি উদ্ধার চাইলেও তা পাচ্ছেন না। ইরাক সমস্যার কোন সামরিক সমাধান নেই। বরং দেশটির ভবিষ্যৎ নিরাপদ করতে চাইলে সে দেশের জনগণকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া কোন সমাধান ইরাকের জন্য প্রযোজ্য হবে না। আমেরিকার জনগণ এ সত্যটি ঠিকই বুঝতে পেরেছে। রাসমুসেন রিপোর্ট পরিচালিত একটি জনমত জরিপে ৫১ ভাগ আমেরিকান বলেন, ইরাক যুদ্ধে আমেরিকার পক্ষে বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, ইরাক যুদ্ধে এ পর্যন্ত ৩,৩৫২ আমেরিকান সৈন্য নিহত ও ২৫ হাযার সৈন্য আহত হয়েছে।

ইরাক যুদ্ধ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক

-সাবেক সিআইএ প্রধান

সিআইএ'র সাবেক পরিচালক জর্জ টেনেট বলেছেন, ইরাক যুদ্ধ সম্পূর্ণ মিথ্যা অজুহাতে শুরু করা হয়। জর্জ টেনেটের লেখা একটি বইতে বলা হয় ২০০৩ সালের ১৯ মার্চ ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন আগ্রাসনের আগে মিথ্যায় ভরপুর বেশকিছু বানোয়াট গোয়েন্দা তথ্য প্রশাসন তাকে দিয়ে অনুমোদন করায়। গোয়েন্দা ফাইলে স্বাক্ষরের আগে তাকে জানতে দেয়া হয়নি যে, আসলে ইরাকে তখন কি ঘটেছিল এবং দেশটির কাছে আদৌ কোন মরণাস্ত্র ছিল কি-না। তিনি বলেন, তাকে আসল ঘটনা ও সত্য জানার সুযোগ দেয়া হয়নি এবং আগ্রাসন শুরুর পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত প্রকৃত ঘটনা তার কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়। তাকে কোন যাচাই-বাছাই এবং পর্যালোচনা করার সময় এবং সুযোগ কোনটিই দেয়নি তারা। ইরাকের কাছে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে বলে যুদ্ধ শুরুর আগে যে প্রচার করা হয়েছিল তা সর্বৈব মিথ্যা। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন এবং তার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন ইরাকী সরকার যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে বলে যে প্রচার করা হয়েছিল এবং তারা সন্ত্রাসের সাথে জড়িত ছিলেন ও পৃথিবীর যেকোন স্থানে মার্কিন স্বার্থে তারা আঘাত হানতে পারে বলে যে তথ্য প্রকাশ করা হয় তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট।

তিনি আরো বলেন, ২০০৩ সালের ১৯ মার্চের আগে ও পরে প্রশাসন ইরাক যুদ্ধের বিষয়টি নিয়ে কোন সিরিয়াস আলোচনাও করেনি। এমনকি তখন বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেসে পর্যন্ত কোন সিরিয়াস আলোচনা হয়নি। তখন যদি মার্কিন কংগ্রেসে সিরিয়াস আলোচনা এবং বিতর্ক হ'ত, তাহ'লে ইরাকে আগ্রাসন এবং অজনপ্রিয় যুদ্ধ শুরুর পিছনে যেকোন যুক্তি ছিল না, তা ধরা পড়ত এবং তাদের আসল উদ্দেশ্যও প্রকাশ হ'ত। ফলে বুশ, ডিক চেনি এবং ডোনাল্ড রামসফেল্ডরা যুদ্ধ শুরু করতে পারতেন না। তিনি বলেন, ইরাকে ২০০৪ সালে প্যাট টিলম্যানের মৃত্যু ও জেসিকা লিঞ্চের অপহৃত হওয়া এবং পরবর্তীতে নাটকীয়ভাবে তাকে উদ্ধারের কাহিনীও বানোয়াট। অজনপ্রিয় যুদ্ধকে জনপ্রিয় করতে ঐ দু'জনকে হিরো বানানো হয়েছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ব্যথা নিরাময়ে ইনফ্রারেড রশ্মি ব্যবহার উপকারী

ইনফ্রারেড রশ্মি সাধারণত তাপশক্তি। একটি থেরাপিটিক ল্যাম্প নামক ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্র থেকে কৃত্রিমভাবে আলোক রশ্মি তৈরী করা হয়। যা সূর্যরশ্মি থেকে প্রাপ্ত রশ্মির মত। ইনফ্রারেড ল্যাম্প লাল হয় এবং যখন জ্বালানো হয়, তখন তা উজ্জ্বল লাল রং ধারণ করে। এটি ত্বকের গভীরে সহজেই ঢুকে যেতে পারে। এই রশ্মির প্রভাবে রক্ত সংবহন এবং কোষের জৈবিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের ল্যাম্প সাধারণত শরীর থেকে ১ ফুট দূরত্বে রেখে কাজ করতে হয় এবং এটি ত্বকে ৫ মিনিটের বেশী রাখা যায় না। এটি সমস্ত দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি না করে ত্বকের প্রয়োজনীয় জায়গায় তাপ বৃদ্ধি করে এবং ত্বকে শিথিলতা আনে। রক্তনালীগুলোকে প্রশস্ত করে এবং ত্বকে রক্ত পরিবহনের মাত্রা বৃদ্ধি করে ত্বকের কোষ কলাকে উদ্দীপিত করে। কোষ কলার মেটাবলিজম বা কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে ও ত্বকের রাসায়নিক পরিবর্তনে সাহায্য করে। যেহেতু এই রশ্মি ত্বকের গভীরে পৌঁছে, ফলে ত্বকের সেই অংশটুকুতে সামান্য গরম ও আরাম অনুভূত হয়, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত মাংসপেশীগুলো শিথিল হয়ে ব্যথা-বেদনা দূর হয়।

কীটনাশক মশারি

নারীর অকালে গর্ভপাতের একটি অন্যতম কারণ হ'ল মশা। মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত মায়েদের গর্ভের সন্তান নষ্ট হ'তে পারে অথবা অসময়ে অপরিপক্ক শিশুর জন্ম হ'তে পারে। আফ্রিকা মহাদেশে এই সমস্যাটা অনেক বেশী। ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের এক গবেষণায় দেখা গেছে, কীটনাশক মিশিয়ে বিশেষভাবে তৈরী মশারি ব্যবহার করে অকালে গর্ভপাত বা গর্ভের শিশুর স্বাস্থ্যহানির মাত্রা এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনা যায়। ঘানা এবং কেনিয়ায় পরীক্ষামূলক ৬ হাযার গর্ভবর্তী মহিলাকে এ ধরনের মশারি ব্যবহার করতে দিয়ে সুফল পাওয়া গেছে। কীটনাশক মিশিয়ে তৈরী মশারি আফ্রিকার দেশগুলোতে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ রকম একটি মশারি তৈরী করতে খরচ পড়ে মাত্র ৪ ডলার।

অতিরিক্ত ওযনে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে

সম্প্রতি 'আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি'র দীর্ঘ ১৬ বছরের গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা গেছে যে, অতিরিক্ত মেদে শুধু স্তন বা জরায়ু ক্যান্সার নয়, হ'তে পারে অন্ত্রনালী, গলাশয়, পাকস্থলী, অগ্নাশয়, কিডনী, গলব্লাডার, ওভারি, লিভার, সার্ভিক্স, প্রস্টেট, লিস্ফ গ্লান্ডের ক্যান্সার। তবে বিজ্ঞানীরা এখনও ফুসফুস, মুত্রথলি ও মস্তিষ্কের ক্যান্সারের সাথে মেদ বৃদ্ধির সম্পর্ক খুঁজে পাননি। মেদ বাড়ার সঙ্গে ক্যান্সারের এমন গভীর সম্পর্কের কারণও খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। মেদ বৃদ্ধির সঙ্গে স্থূলকায় ব্যক্তির রক্তে বেশকিছু হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। এদের মধ্যে রয়েছে সেক্স স্টেরয়েড, ইনসুলিন এবং ইনসুলিনের মত গ্লোথ ফ্যাক্টর-১ ইত্যাদি। এরাই ক্যান্সার উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। 'দ্যা নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন' পত্রিকার একটি প্রবন্ধ থেকে জানা গেছে, যেসব মেদ বহুল ব্যক্তির 'বডি মাস ইন্ডেক্স' বা বিএম আই ২৫-৩০, তাদের লিভার ক্যান্সারে মৃত্যুর আশংকা স্বাভাবিক বিএমআই (২৫) ধারীদের চেয়ে ১৩ শতাংশ বেশী।

উচ্চ রক্তচাপের কারণ হৃদযন্ত্রে নয় মস্তিষ্কে

বৃটেনে বিজ্ঞানীদের এক গবেষণায় জানা গেছে যে, উচ্চ রক্তচাপের কারণ হৃদযন্ত্রে নয়, বরং মানুষের মস্তিষ্কে। ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মানুষের মস্তিষ্কে জ্যামওয়ান নামে এক ধরনের প্রোটিন তারা খুঁজে পেয়েছেন, যা শ্বেত রক্তকণিকাকে আটকে রাখে। যার ফলে সেগুলো ফুলে উঠে রক্তপ্রবাহে বাধা দেয়। এতদিন পর্যন্ত উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা হৃদযন্ত্রে ও ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচলের বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেছেন, তাদের এই আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসার নতুন উপায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

লবণ থেকে সাবধান

হৃদরোগ নিরাময়ে কম লবণযুক্ত খাবার যে সহায়ক, তার প্রমাণ পেয়েছে বিজ্ঞানীরা। লবণ কম খেলে হৃদরোগের প্রকোপ কমে এমন ধারণাটি সবার মাঝে প্রচলিত থাকলেও কিভাবে তা কার্যকর হয়, তা জানা ছিল না বিজ্ঞানীদের। পরীক্ষায় দেখা গেছে, উচ্চ রক্তচাপযুক্ত রোগীদের খাবারে লবণের পরিমাণ ২৫ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশ হ্রাস করার পর রোগীর হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ন্যাশনাল হার্ট, 'লাং এ্যান্ড ব্লাড ইনষ্টিটিউটে'র এমডি জেযরি কাটলারের মতে কম লবণযুক্ত খাবার হার্টে বিরূপ প্রভাব ফেলে। তার এমন দাবীর পর গবেষকরা ২ হাযার ৪১৫ রোগীর উপর দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে কম লবণযুক্ত খাবার দিয়ে পরীক্ষা চালান। এতে দেখা গেছে, যারা নিয়মিত কম লবণযুক্ত খাবার খেয়েছে, তাদের হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। ঠিক একইভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও অনেক কমে গেছে।

স্ট্রবেরির গুণ

স্ট্রবেরি ভাল তবে এগুলো দিয়ে তৈরী ককটেল স্বাস্থ্যের জন্য বেশী ভাল। এক গবেষণায় এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এই ফলটিতে এমন সব উপাদান রয়েছে যা, ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং গেঁটেবাত প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। কিন্তু এই ফলের সঙ্গে যদি অ্যালকোহল মেশান হয় তাহ'লে এর গুণাগুণ অনেক বেড়ে যায়। 'সায়েন্স অব ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার জার্নালে' এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। থাইল্যান্ডে কাসেটস্টার্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং মার্কিন কৃষি গবেষণা সার্ভিস বিভাগের গবেষকরা ফলকে কিভাবে আরো দীর্ঘ সময় টাটকা রাখা যায় তার কার্যকর উপায় নিয়ে গবেষণাকালে এ তথ্য পান। তারা দেখতে পান স্ট্রবেরির সঙ্গে অ্যালকোহল মেশালে তার পুষ্টি বেশ খানিকটা বেড়ে যায়।

ক্যান্সারের বিকল্প চিকিৎসা

অ্যালোপ্যাথির পাশাপাশি বিকল্প (আয়ুর্বেদ) চিকিৎসায় ক্যান্সার রোগীরা সুস্থ হয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করছে। আধুনিক অ্যালোপাথি চিকিৎসার সঙ্গে মুমূর্ষ রোগীদের জন্য ভারতীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা অত্যন্ত যরূরী, একথা জানিয়েছেন ক্যান্সার চিকিৎসা ও গবেষণায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সংস্থা 'আমেরিকান সোসাইটি ফর ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজী'। এই আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকে বলা হচ্ছে, 'কমপ্লিমেন্টারি অলটারনেটিভ মেডিসিন' (ক্যাম)। ক্যামে'র সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসাকে একত্র করে এন্ট্রিগ্রেটেড অঙ্কোলজি বলে নতুন ধারা চালু করা হয়েছে। বিকল্প এই চিকিৎসা ব্যবহার করে ইতিমধ্যে ভাল আছেন অনেকে। বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসকগণ বলেছেন, এই বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি ও ওষুধ মরণাপন্ন রোগীদের মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। এখন সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিকল্প চিকিৎসার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী সভা

সিরাজগঞ্জ, ৩রা এপ্রিল, মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারীর সিরাজগঞ্জ শহরস্থ বাসভবনে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জনাব আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বৈঠকে শতাধিক মুছল্লী উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি কুরআন-হাদীছের আলোকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন।

ভবানীপুর, পাতুলী, টাঙ্গাইল ৪ এপ্রিল বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর ভবানীপুর পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ।

খয়েরসূতী, পাবনা ৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর খয়েরসূতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম। প্রধান অতিথি উপস্থিত সকলকে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তোলার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

বাঁশবাড়িয়া, গাংনী, মেহেরপুর ১৮ এপ্রিল, বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর স্থানীয় বাঁশবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব বাগলুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুল গণীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মুমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার ও যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ আবুল কালাম প্রমুখ।

দামুরহুদা, চুয়াডাঙ্গা ২৮ এপ্রিল, শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর স্থানীয় গৌরিনগর জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। হরিরামপুর এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব খবীরুদ্দীন বিশ্বাস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ তারিকুযযামান, মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মুমিন ও সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রশীদ আখতার।

ইসলামী জালসা

দূর্বাডাংগা, যশোর ২২ এপ্রিল রবিবারঃ অদ্য বিকাল ৫-টায় স্থানীয় দূর্বাডাংগা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম জনাব মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী জালসায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আহাদ ও যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান প্রমুখ।

ইত্যা, যশোর ২৩ এপ্রিল সোমবারঃ অদ্য বিকাল ৫-টায় ইত্যা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জালসায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন ও গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আবুল খায়ের, ইত্যা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল লতীফ, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান ও 'যুবসংঘ'-এর কর্মী হাফেয মীযানুর রহমান প্রমুখ।

আলোচনা সভা

ধর্মদহ, দৌলতপুর ১৪ এপ্রিল শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর ধর্মদহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে পিতার ভূমিকা' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুষ্টিয়া পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব গরীবুল্লাহ বিশ্বাস-এর সভাপতিত্বে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়ার সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ তারীকুযযামান ও মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার।

পাঠকের মতামত

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান সমীপে

সংবাদপত্র পাঠকমাত্রই জানেন যে, বুশ-ব্লেয়ার চক্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে যে কোন ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুয়ান্তামো বা আবুগারিব কারাগারে বিনা বিচারে বছরের পর বছর বন্দী করে রাখে এবং নানারূপ অমানবিক অত্যাচার-উৎপীড়ন চালায়। এ ঘটনা বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশ পাওয়ার ফলে আজ বিশ্বব্যাপী এর বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠেছে, জানাচ্ছে নিন্দা ও তীব্র প্রতিবাদ। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, অনুরূপ নির্মম ঘটনা আমাদের দেশেও ঘটছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

গত **১১** ফেব্রুয়ারী '০৭ তারিখের দৈনিক নয়াদিগন্তের **১১** পৃষ্ঠায় 'নির্দোষ শাহ আলম বাবুর মৃত্যুদণ্ড' শিরোনামে প্রকাশিত খবরটি পড়লেই এর সত্যতা জানা যাবে। খুন না করেও কনডেম সেলে মৃত্যুর প্রহর গুণছিল ঐ যুবক। তদন্ত কারী পুলিশ কর্মকর্তা রেযাউল করীমের উদ্দেশ্যমূলক রিপোর্টের কারণেই তার এই অবস্থা। যদিও মামলার বাদিনী স্বামীর হত্যাকাণ্ডের চাক্ষুষ সাক্ষী রোকেয়া বেগম নির্দোষ শাহ আলমকে আসামী করেননি এবং সে হত্যাকারী নয় বলেও সাক্ষ্য প্রদান করেন।

বিষয়টি জানতে পেরে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এ্যাডভোকেট এলিনা খানের তৎপরতায় এবং বাদী পক্ষের মামলা পরিচালক ঐ সংস্থার মহাসচিব সিগমা হুদার সহযোগিতায় পরে শাহ আলম বাবু মুক্তি পেয়েছে। এই ঘটনার কিছুদিন আগেও খবরের কাগজে মায়ের কোলে চড়ে একটি শিশুকে কোর্টে হাযির হওয়ার দৃশ্য দেখেছিলাম। ঐ শিশুটি নাকি একটি হত্যা মামলার আসামী! আর সে মামলায় আমাদের দেশের বিচারক মহাশয়ের নির্বিকার চিত্ততা জেনে অবাক হ'তে হয় এই ভেবে যে, তিনি বিচারক হয়েও বুঝতে পারলেন না যে একটি কোলের শিশু কি করে হত্যাকারী হ'তে পারে? আরেকটি বিস্ময়কর খবর হ'ল- আসামীর নামের সঙ্গে মিল থাকার কারণে জেল খাটছে বুরহানুদ্দীন মোল্লা নামে নারায়ণগঞ্জের সোনার গাঁও থানার ফুলবাড়িয়া গ্রামের একজন চা বিক্রেতা। তার পিতা মৃত বশিরুদ্দীন মোল্লা। অথচ প্রকৃত আসামীর নাম বুরহান গাযী, পিতা নূরুল গাযী, গ্রাম হাবিয়া, থানা সোনারগাঁও। সে ঢাকায় চাকুরী করত। *(নয়াদিগন্ত ১১ মার্চ '০৭, ১১ পৃষ্ঠা)*। কি অদ্ভুত এ দেশের অবস্থা।

অনুরূপভাবে এই জাতির জন্য আরেকটি বিস্ময়কর ও অবাক করার মত কাহিনী হচ্ছে, নির্ভেজাল তাওহীদের ধারক, বাহক ও প্রচারক **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** মিথ্যা অযুহাতে গ্রেফতার করা। যিনি অন্যায়, অবিচার, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের উপর বিদেশীদের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদী কণ্ঠ, উপরন্তু তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর এবং দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীট বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ প্রফেসর।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** বিনা বিচারে অন্যায়ভাবে দীর্ঘ দু'বছর অধিককাল যাবৎ কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব লুৎফুযযামান বাবর বিভিন্ন সময়ে সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, ডঃ গালিবের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের ফলে একজন সৎ ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষককে কারাগারে এক অন্ধ প্রকোষ্ঠে অমানবিক জীবন যাপন করতে হচ্ছে। জাতির জন্য এটা এক মহাকলঙ্কজনক অধ্যায়। যে জাতি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষকের মর্যাদা দিতে জানে না, সে জাতি কোন দিন উন্নতি লাভ করতে পারে না। বরং তাদেরকে অন্যান্য জাতির নিকট হেয় প্রতিপন্ন হ'তে হয়। হক্বপন্থী আলেম ওলামার প্রতি যুলুম-নির্যাতনের অশুভ ফল তাদেরকে ইহকালেও ভোগ করতে হবে এবং পরকালেও ভোগ করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইন্দোনেশিয়ার প্রখ্যাত আলেম বশীর আহমাদের উপর যুলুম ও উৎপীড়নের কারণে সুনামী দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাদের সতর্ক করেছেন। অনুরূপভাবে আমাদের দেশেও আল্লাহ্র গযব নাযিল হওয়া বিচিত্র নয়।

ডঃ গালিবই সর্বপ্রথম লেখনীর মাধ্যমে পূর্ববর্তী সরকারকে জঙ্গীদের সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে তখন কান দেয়নি, বরং উল্টো তাকেই উক্ত অভিযোগে গ্রেফতার করে জাতির সাথে জঘন্য প্রতারণা করেছে।

জাতির বিবেকের কাছে আমার প্রশ্ন- বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ প্রফেসর কি সিনেমা হলে বোমা হামলা চালাতে পারেন? কিংবা রাতের অন্ধকারে শতশত কিলোমিটার দূরে ভিন্ন যেলায় গিয়ে ডাকাতি করতে পারেন? অথচ কুচক্রীদের কারসাজিতে তাঁর বিরুদ্ধে এরকম জঘন্য মিথ্যার মহরত চালানো হয়েছে।

আমরা বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকটে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই এ বিষয়ে যথাযথ নযর দিয়ে একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের প্রতি সুবিচার করবেন, এটাই জনগণের প্রত্যাশা।

** মাযহারুল হান্নান*
সহকারী শিক্ষক (অবঃ)
গভঃ ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, রাজশাহী।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৭১)ঃ সূরা নাজমের ১৯ ও ২০ নং আয়াত নাযিলের সময় শয়তান নাকি রাসূল (ছাঃ)-এর মনে দু'টি কালেমা বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। যেখানে মানাত দেবীর প্রশংসা করা হয়েছে। উক্ত ঘটনা কি সঠিক? ঐ কালেমা দু'টি কী ছিল?

- আব্দুল আলীম
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ তাফসীরে তাবারীতে উক্ত আয়াতদ্বয় সম্পর্কে যে ঘটনা বর্ণিত আছে, তা ছহীহ নয়। ঘটনাটি হ'ল- 'রাসূল (ছাঃ) একদা কুরাইশদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সে সময় কামনা করছিলেন যেন তাঁর উপর কোন ওহী অবতীর্ণ না হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা উক্ত সময়ে সূরা নাজম অবতীর্ণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সূরাটি পড়তে পড়তে أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى। পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন এ আয়াতের সাথে শয়তান تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى এ বাক্য দু'টি বৃদ্ধি করে দেয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরাটি পড়ে সিজদা করলে কুরাইশরাও তার সাথে সিজদা করে। এমনকি তাদের মধ্যে ওয়ালিদ বিন মুগীরা সিজদা করতে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সে তার সামনে মাটি নিয়ে সিজদা করে। কারণ শয়তানের বৃদ্ধি করা বাক্যদ্বয়ে তাদের মূর্তির প্রশংসা করা হয়েছে। এ কারণে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিবরীল (আঃ) যখন আসলেন, তখন তিনি সূরা নাজম পড়তে লাগলেন। আয়াতগুলির সাথে তিনি যখন উক্ত বাক্য দু'টি পড়লেন, তখন জিবরীল (আঃ) বললেন, আমি তো এটা বলিনি'।

উক্ত বর্ণনা ঠিক নয়; বরং পবিত্র কুরআনের সরাসরি বিরোধী। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, কোনদিক থেকেই এ কিতাবে 'বাতিল হস্তক্ষেপ করতে পারে না' *(হা-মীম সাজদাহ ৪২)*।

প্রশ্নঃ (২/২৭২)ঃ গন্ধম খাওয়া যদি অপরাধই হয় তাহ'লে আল্লাহ এটা কেন জান্নাতে সৃষ্টি করে রাখলেন?

- মুহাম্মাদ মহিরুদ্দীন
গোপালপুর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর জন্য জান্নাতের সর্বপ্রকার গাছের ফল খাওয়া বৈধ ছিল। কেবলমাত্র একটি গাছের ফল খেতে আল্লাহ নিষেধ করেছিলেন। এটা ছিল মূলতঃ তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯)*। উল্লেখ্য যে, উক্ত গাছের বা ফলের নাম 'গন্ধম' বলে বহুল প্রসিদ্ধ হ'লেও এ বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩/২৭৩)ঃ যারা সপ্তাহে মাত্র এক ওয়াক্ত ছালাত পড়ে আর অন্য ওয়াক্তগুলি পড়ে না, তারা কি কাফির, না মুনাফিক?

- আব্দুর রহীম
বিশোহারা, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এমন ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ) কাফের বলেছেন *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৭৪)*। ছাহাবীগণও তাদেরকে কাফের মনে করতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৯)*। রাসূল (ছাঃ) এমন ব্যক্তির সাথে লড়াই করে তাদেরকে ছালাত আদায়ে বাধ্য করতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২)*। কারণ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের মধ্যে শুধু এক ওয়াক্ত আদায় করলে আল্লাহ্র ফরয হুকুম পালন হবে না। এছাড়া কেউ যদি শুধু চার ওয়াক্ত পড়ে আর এক ওয়াক্ত বাদ দেয় তবুও সে ছালাত তরককারীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্নঃ (৪/২৭৪)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি اللهم صل على محمد... বলে দরূদ পড়ার পরিবর্তে যদি কেউ اللهم صل على سيد نا حبيبنا... বলে দরূদ পড়ে তাহ'লে তা ঠিক হবে কি?

- মাহতাবুদ্দীন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের ক্ষেত্রে اللهم صل على محمد... বা দরূদে ইবরাহীম পাঠ করতে হবে। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯১৯)*। এতদ্ব্যতীত মানুষের তৈরীকৃত বিভিন্ন মনগড়া দরূদ পাঠ করা বিদ'আত। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রঃ) বলেন, 'হাদীছে বর্ণিত শব্দ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ দ্বারা

Contents

দরূদ পাঠ করা যাবে এরূপ কোন বর্ণনা ছাহাবী বা তাবেঈ থেকে আমরা অবগত নই' *(মুহাব্বাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮০)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৭৫)ঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা ও চাচা কি মুশরিক ছিলেন? কোন নবী-রাসূলের পিতা কি মুশরিক হ'তে পারেন?

- মুহাম্মাদ জাহিদুর রহমান
ভূরুলিয়া, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা ও চাচা মুশরিক ছিলেন এবং মূর্তি পূজারী ছিলেন *(আন'আম ৭৪)*। কোন নবী-রাসূলের পিতা মুশরিক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পিতাও মুশরিক ছিলেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৫৭২, সনদ ছহীহ, 'মুশরিকদের কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৭৬)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি কখনও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন?

- মজনুর রহমান
দক্ষিণ তলাইগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলেছেন *(তাহরীম ৯)*। তবে মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করার মর্মার্থ হচ্ছে মৌখিক জিহাদ। অর্থাৎ তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য শক্তভাবে আমন্ত্রণ জানানো, যাতে তারা ইসলামের দাবিতে নিষ্ঠাবান হ'তে পারে। মুনাফিকদের বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) সরাসরি অস্ত্রধারণ করেছিলেন মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৭/২৭৭)ঃ তেলাওয়াতে সিজদা কয়টি? সিজদার আয়াত তেলাওয়াত বা শ্রবণ করে কেউ যদি সিজদা না করে তাহ'লে তার হুকুম কি?

- শাফা'আত
বংশাল, নাজির বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ তেলাওয়াতে সিজদা ১৫টি *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারাকুৎনী, নায়ল ৩/৩৮৬-৯১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৫)*। পবিত্র কুরআনে এমন কতগুলি আয়াত রয়েছে যেগুলি তেলাওয়াত করলে বা শুনলে মুমিন পাঠক ও শ্রোতা সকলকে একটি সিজদা করতে হয়। তবে কেউ যদি এই সিজদা না করে তাহ'লে সে গুনাহগার হবে না। কারণ এটি ফরয সিজদা নয়। করলে নেকী আছে, না করলে গুনাহ নেই *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৩৪১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৪)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৭৮)ঃ ইমাম মাগরিবের ছালাত আরম্ভ করেছেন এমন সময় তার মনে পড়েছে যে, তিনি আছরের ছালাত আদায় করেননি। এমতাবস্থায় তার করণীয় কি?

- শামীমুযযামান
করখণ্ড, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় মাগরিবের ছালাত সমাপ্ত করবেন। অতঃপর আছরের ছালাত আদায় করবেন *(ফাতাওয়া উছায়মীন প্রশ্নোত্তর নং ১০৩৩, পৃঃ ১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৭৯)ঃ তাহাজ্জুদ ও বিতর ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা যাবে কি?

- আব্দুল্লাহ আল-মামুন
কাটিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদ ও বিতর ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাঝে মধ্যে ছাহাবীদের সাথে জামা'আত সহকারে তাহাজ্জুদ ও বিতর ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৯৫ 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৮০)ঃ মুসলমানীর অনুষ্ঠান, জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যাওয়া জায়েয কি?

- আকরাম হোসাইন
বেলঘড়িয়া, বাইপাশ, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত অনুষ্ঠান সমূহ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম পালন করেননি। তাদের যুগে ছিলও না। এ ধরনের অনুষ্ঠানগুলি শরী'আতের নামে পরবর্তীতে নতুনভাবে চালু হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করল, যা তার মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*। এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ও সহযোগিতা করা অন্যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ২)*।

প্রশ্নঃ (১১/২৮১)ঃ লোক মুখে শোনা যায়, প্রেম-ভালবাসা নাকি পবিত্র জিনিষ। উদাহরণ স্বরূপ লাইলী-মজনুর কথা বলা হয়। লাইলী-মজনুর প্রেমকাহিনী নাকি কুতুবে সিত্তাহর হাদীছে আছে। যারা কোনদিন দাড়ি কাটেনি তারা নাকি জান্নাতে লাইলী-মজনুর বিয়ের বরযাত্রী হবে। এ সমস্ত কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- শামীম সরকার
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত কথাগুলি সবই মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এ সমস্ত মিথ্যা প্রেমকাহিনী বলা ও শুনা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক। এই ভিত্তিহীন কাহিনী প্রচার করে বর্তমানে প্রচলিত প্রেম-ভালবাসাকে উস্কে দেয়া হচ্ছে, যা যুব চরিত্র ধ্বংস করছে। সমাজে অশ্লীলতা ও নোংরামির প্রসার ঘটাচ্ছে। মুসলিম সমাজের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই।

প্রশ্নঃ (১২/২৮২)ঃ অবৈধ টাকা ঋণ নিয়ে বৈধভাবে ব্যবসা করে উপার্জন করা যাবে কি?

- হানযালা

Contents

চাঁদপুর, বামনডাঙ্গা, রূপসা, খুলনা।

উত্তরঃ অবৈধ টাকা কর্য নিয়ে বৈধভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করে মুনাফা অর্জন করা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০ 'বেচা-কেনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২৮৩)ঃ ইক্বামত শেষে দরূদ পড়ার স্বপক্ষে কোন দলীল আছে কি?

- ডাঃ বযলুর রশীদ
চণ্ডীপুর, যশোর।

উত্তরঃ ইক্বামত শেষে দরূদ বা অন্য কোন দো'আ পড়ার ব্যাপারে কোন দলীল নেই। তবে ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই ইক্বামতের জবাব দিতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত, হা/৬৪৭)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৮৪)ঃ ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়ার পর পরস্পর দু'টি সূরা পড়া যাবে কি?

- রূহুল আমীন
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়ার পর পরস্পর দু'টি বা ততোধিক সূরা পড়া যায় *(বুখারী, তিরমিযী, নায়লুল আওত্বার ২/৮০ 'প্রত্যেক ছালাতে দু'দু'টি সূরা পড়া' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, নাসাঈ, নায়ল ২/৮১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৮৫)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, পেশাব-পায়খানায় থুথু ফেললে শয়তান মনে কুমন্ত্রণা দেয়। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

- মাসুম বিল্লাহ
কলাতলী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। এ মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১৬/২৮৬)ঃ জনৈক ইমাম বলেছেন, ধূমপান, তামাক এবং জর্দা যারা খায় না তারাই হারাম বলে। আসলে তা খাওয়া জায়েয। এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

- তাযুল ইসলাম
গাছবাড়ী, সিলেট।

উত্তরঃ যারা উক্ত অপবিত্র ঘৃণিত ও দুর্গন্ধযুক্ত হারাম ছাড়তে পারে না তারাই কেবল এ ধরনের মন্তব্য করে থাকে। মূলতঃ জর্দা ও তামাক মাদকদ্রব্য হিসাবে পরিস্কার হারাম ও অপবিত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করা হয়েছে' *(আ'রাফ ১৫৭)*। আর যে জিনিস বেশী খেলে মাদকতা আসে তার সামান্য পরিমাণও হারাম *(ছহীহ তিরমিযী হা/১৯৪৩; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩৩৯৩)*। সুতরাং ধূমপান যে হারাম ও অপবিত্র তাতে সন্দেহ নেই। এছাড়া এটা অপচয়েরও শামিল। আর অপচয়কারী শয়তানের ভাই *(বনী ইসরাঈল ২৭)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৮৭)ঃ সূরা মায়েদার ৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত 'অসীলা'র অর্থ কি?

- মুহাম্মাদ শামীম সরকার
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতে অসীলা দ্বারা ইবাদত ও আমলের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করাকে বোঝানো হয়েছে। মূলতঃ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে এবং যেসব কাজে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন সেসব কাজের মাধ্যমে তার নৈকট্য অর্জন করাকে 'অসীলা' বলে' *(তাফসীর ইবনে কাছীর ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০০)*। উল্লেখ্য যে, ভণ্ড পীর-ফকীর ও পেটপুঁজারী সুবিধাভোগীরা 'অসীলা' শব্দের অর্থ পীর ধরা বলে অপব্যাখ্যা কওে থাকে, যা সম্পূর্ণ মনগড়া ও মিথ্যা। কুরআন-সুন্নাহর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নঃ (১৮/২৮৮)ঃ মামীর আপন খালাতো বোনকে বিবাহ করা কি জায়েয?

- আনোয়ার হোসাইন
বামনগ্রাম, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ মামীর আপন খালাতো বোনকে বিবাহ করায় শারঈ কোন বাধা নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম করেছেন মামীর আপন খালাতো বোন তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২৮৯)ঃ হিন্দুদের মেলায় যাওয়া কি গুনাহের কাজ?

- এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ যে সমস্ত জায়গায় শিরক-বিদ'আত ও শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ হয় সেখানে বেচা-কেনা ও ব্যবসা করা, যাওয়া এবং সহযোগিতা করা গুনাহের কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ২; ফাতাওয়া ছানাইয়া ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯০)*। সুতরাং হিন্দুদেও মেলায় যাওয়া থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (২০/২৯০)ঃ সংসার চালানোর জন্য করযে হাসানা না পাওয়ায় ৬ মাস মেয়াদী ঋণ নিয়ে ফসল উৎপাদন করি। অতঃপর ফসল উঠানোর পর সূদ সহ তা পরিশোধ করি। এভাবে ঋণ গ্রহণ করা যাবে কি? ঈাপমুক্ত ঋণ কিভাবে করব?

- মহিরুদ্দীন
গোপালপুর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

Contents

উত্তরঃ কুরআন মাজীদে যেসব বিষয় হারাম করা হয়েছে, সূদ সেগুলির অন্যতম *(বাক্বারাহ ২৭৫; ফাতাওয়া ছানাইয়া, পৃঃ ৪৩০)*। উক্ত পদ্ধতিতে ঋণ গস্থহণ সূদ মুক্ত নয়। বিধায় তা পরিত্যাজ্য। তবে শরী'আত সমর্থিত বিকল্প যেকোন পন্থায় হালাল উপার্জনের চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২১/২৯১)ঃ আযান চলা অবস্থায় বাড়ীতে বা মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি? জুম'আর দিনে আযান চলা অবস্থায় মসজিদে হাযির হ'লে ছালাত শুরু করতে পারবে কি?

- ডাঃ বযলুর রশীদ
চণ্ডীপুর, যশোর।

উত্তরঃ আযান চলাকালীন মসজিদে প্রবেশ করলে আযানের জওয়াব দেওয়াই উত্তম। অতঃপর আযানের দো'আ পড়ার পর তাহিইয়াতুল মসজিদ ছালাত আদায় করে বসবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮-৫৯; ফাতাওয়া উছায়মীন, ১২/১৯৩)*।

প্রশ্নঃ (২২/২৯২)ঃ কুফর কত প্রকার ও কি কি?

- আব্দুল ওয়াদূদ
ধামতি, মিরবাড়ী
দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কুরআন-সুন্নাহ বিশ্লেষণ করলে কুফরকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- **(ক) কুফরে আকবার** বা বড় কুফর- যা মানুষকে ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। একে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) মিথ্যা প্রতিপন্নের মাধ্যমে কুফরী করা (২) সত্যের প্রতি অহংকার ও অস্বীকারের মাধ্যমে কুফরী করা (৩) সন্দেহের মাধ্যমে কুফরী করা (৪) মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে কুফরী করা ও (৫) মুনাফেকীর মাধ্যমে কুফরী করা।

(খ) কুফরে আছগার বা ছোট কুফরী- যা মানুষকে ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না। এই কুফরী বিভিন্ন কাজের দ্বারা সংঘটিত হয়। যাকে কুরআন ও সুন্নায় কুফরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বড় কুফরীর সীমা অতিক্রম করে না *(নাহল ১১২; কিতাবুত তাওহীদ, শায়খ ডঃ ছালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৯৩)ঃ কথা প্রসঙ্গে অনেকেই বলে 'আমার জন্য দো'আ করবেন'। এ সময় কী বলে দো'আ করতে হবে?

- সিরাজুল ইসলাম
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কেউ দো'আ চাইলে তিনি ঐ ব্যক্তির চাহিদা ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্নভাবে দো'আ করতেন। যেমন-

(১) আনাস (রাঃ)-এর মাতা আনাসের জন্য দো'আ চাইলে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

اللهم أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَاَطِلْ عُمْرَهُ وَاغْفِرْلَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا رَزَقْتَهُ–

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আকছির মালাহু ওয়া ওলাদাহু ওয়া আতিল উমরাহু ওয়াগফির লাহু ওয়া বারিক লাহু ফীমা রাযাকতাহু।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দিন, তার আয়ু বাড়িয়ে দিন, তাকে ক্ষমা করুন এবং তাকে যা রূযী দিয়েছেন তাতে বরকত দিন *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪০)*।

(২) আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে খুশী মনে দেখলেই বলতেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার জন্য দো'আ করুন। তখন তিনি বলতেন,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَت–

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফির লি 'আয়েশাতা মা তাক্বাদ্দামা মিন যানবিহা ওয়ামা তাআখখারা ওয়া মা আসাররাত ওয়া মা আ'লানাত।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ তুমি আয়েশার আগের পরের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দাও' *(সিলসিলা ছহীহাহ, হা/২২৫৪)*।

(৩) হুযায়ফা (রাঃ) দো'আ চাইলে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحُزَيْفَةَ وَلِأُمِّهِ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মাগফির লিহুযায়ফাতা ওয়ালি উম্মিহী। **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ আপনি হুযায়ফা ও তার মাকে ক্ষমা করুন'।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলির আলোকে বলা যায় যে, কেউ কারো নিকটে দো'আ চাইলে প্রার্থিত ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী দো'আ করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রথোমুক্ত দো'আটি অনেকটা আম বা ব্যাপকার্থক বিধায় এটি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে কাউকে বিদায় দেয়ার সময় রাসূল (ছাঃ) বলতেন,

اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَ أَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَ يَسَّرَلَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ–

অর্থঃ 'আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং শেষ আমল আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আল্লাহ তোমাকে তাক্বওয়া দান করুন, তোমার পাপ ক্ষমা করুন, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজসাধ্য করুন' *(তিরমিযী, মিশকাত, পৃঃ ২১৫ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৯৪)ঃ দাঁড়িয়ে জুতা-সেন্ডেল পরা নিষেধ মর্মের হাদীছটি কি ছহীহ?

- আশরাফ
জামিরা, রাজশাহী।

Contents

উত্তরঃ উক্ত হাদীছ ছহীহ। জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৪১৪, ১৫১৫)*। অবশ্য বিদ্বানগণ মনে করেন, বসে পরিধান করলে সুবিধা হয় এজন্য নবী করীম (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। কারণ জুতা পরার সময় ও ফিতা আটকানোর প্রয়োজনে মাথা নিচু করতে হয়। তাই উক্ত কষ্টের পরিবর্তে বসে পরার কথা বলা হয়েছে *(আউনুল মা'বূদ ৭/২৩৫ পৃঃ)*। উল্লেখ্য, জুতা পরার সময় ডান পায়ের জুতা আগে পরতে হবে এবং খোলার সময় বাম পায়ের জুতা আগে খুলতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪১০)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৯৫)ঃ নবী করীম (ছাঃ) যখন খেতেন তখন খাদ্য তাসবীহ পাঠ করত। একথা কি সত্য?

- শাহাবুদ্দীন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত কথা সত্য। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনকে ভয়ের কারণ মনে কর। আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আল্লাহ্র যেকোন নিদর্শনকে বরকত মনে করতাম। আমরা যখন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খাদ্য খেতাম, তখন খাদ্যের তাসবীহ পড়া শুনতে পেতাম *(বুখারী, তিরমিযী হা/৩৬৩৩)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৯৬)ঃ জনৈক খত্বীব বলেন, মুহাররমের ১ম থেকে ১০টি ছিয়াম পালন করলে ৫০ বছরের নফল ছিয়ামের নেকী লেখা হয়। একথা কি সত্য?

- নাজমুল হাসান
বাশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যের ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। মুহাররমের ফযীলত সম্পর্কে এরূপ অসংখ্য জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনা রয়েছে, যেগুলি থেকে বিরত থাকা যরূরী।

প্রশ্নঃ (২৭/২৯৭)ঃ স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজনের নিকটে দো'আ চাইতে পারে কি?

- আব্দুছ ছামাদ
কলাবাগান, ঢাকা।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে দো'আ করার জন্য বলতে পারে। এভাবে দো'আ করতে বলা সুন্নাত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে খুশী মনে দেখলেই আমার জন্য দো'আ করতে বলতাম। তিনি আমার জন্য বলতেন-

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَـأَخَّرَ وَمَـا أَسَـرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ–

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফির-লি 'আয়েশাতা মা তাক্বাদ্দামা মিন যানবিহা ওয়ামা তাআক্ষারা ওয়ামা আসাররাত ওয়ামা আ'লানাত।

'হে আল্লাহ তুমি আয়েশার আগের পরের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দাও' *(সিলসিলা ছহীহাহ ২২৫৪)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৯৮)ঃ কোন্ দেশের সরকার নবী করীম (ছাঃ)-এর পত্র ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করেছিল?

- তাজাম্মুল হক্ব
বিশ্বনাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইরানের বাদশাহ পারভেয ইবনু হুরমুয ইবনে নওশেরওঁয়া নবী করীম (ছাঃ)-এর পত্র ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করেছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু হোযাফা (রাঃ)-এর মাধ্যমে নবী করীম (ছাঃ) ইরান সরকারের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। পত্রটি তার হস্তগত হ'লে নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে সে পত্রটি ছিঁড়ে ফেলেছিল। এ খবর শুনে নবী করীম (ছাঃ) তার জন্য বদদো'আ করেছিলেন *(সিলসিলা ছাহীহহা হা/১৪২৯)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৯৯)ঃ ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত প্রচলিত ঘটনাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন?

- আব্দুল কুদ্দুস
রাজাশন, ঢাকা।

উত্তরঃ ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত ঘটনাটি ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। বরং নবী করীম (ছাঃ)-এর দো'আর কারণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন একথাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) দো'আ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ ওমর এবং আবু জাহলের মধ্যে যাকে তুমি পসন্দ কর তার দ্বারা তুমি ইসলামকে শক্তিশালী কর। দু'জনের মধ্যে ওমর (রাঃ) আল্লাহ্র নিকট পসন্দনীয় ছিলেন *(তিরমিযী হা/৩৬৯০)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩০০)ঃ ভালবাসায় শিরক বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

- আমানুল্লাহ
কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ভালবাসার ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-কে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ পূর্ণাঙ্গ মুমিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ তার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির চেয়ে রাসূল (ছাঃ) তার নিকট প্রিয়তর না হবে' *(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০ 'ঈমান' অধ্যায়; 'রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসা' অনুচ্ছেদ)*। আর আল্লাহ এবং রাসূল (ছাঃ)-কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ভালবাসার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করাই হচ্ছে ভালবাসায় শিরক। বর্তমান সমাজে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-কে বাদ দিয়ে ভালবাসায়

Contents

পীর বা ওলী-আওলিয়াদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের কার্যকলাপকারীদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি *(তওবা ২৪)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩০১)ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের পর কোন কোন ইমাম মুনাজাত করেন আবার কোন কোন ইমাম করেন না। কোনটি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন?

- মুহাম্মাদ সইবুর রহমান
দেবীপুর রহমানীয়া মাদরাসা
লালপুর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'মুনাজাত' অর্থ পরস্পরে গোপনে কথা বলা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতে রত থাকে তখন সে তার প্রভুর সাথে মুনাজাত করে, অর্থাৎ গোপনে কথা বলে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭১০)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(মুমিন ৬০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দো'আ হ'ল ইবাদত *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/২২৩০, 'দো'আ' অধ্যায়)*। অতএব দো'আ ইবাদত হিসাবে তার পদ্ধতি সুন্নাত মুতাবেক হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন্ পদ্ধতিতে দো'আ করেছেন, আমাদেরকে সে পদ্ধতিতেই দো'আ করতে হবে। তার রেখে যাওয়া পদ্ধতি ছেড়ে অন্য কোন পদ্ধতিতে দো'আ করলে তা কবুল হওয়ার বদলে গোনাহ হবে। ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের সরবে দো'আ পাঠ ও মুক্তাদীর সশব্দে 'আমীন, 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও সহাবায়ে কেরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন দলীল নেই *(ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মাসিক 'মুহাদ্দিছ' (বেনারস জুন'৮২) পৃঃ ১৯-২৯)*। তবে বিভিন্ন স্থানে হাত তুলে দো'আ করার একাধিক ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায়। যেমন- সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময়, যুদ্ধ ক্ষেত্রে, বৃষ্টি প্রার্থনার সময় একাকী কবর যিয়ারতের সময়, সফরে, কারো কোন ভুল-ত্রুটি দেখে, হজ্জে পাথর নিক্ষেপের সময়, সাফা-মারওয়ায়, কা'বা ঘর দেখে, কবরের শাস্তির কথা শুনে ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ (৩২/৩০২)ঃ জনৈক মাওলানা বলেছেন, কালেমা ত্বাইয়েবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলা শিরক। কোন্ কারণে উহা শিরক জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আতীকুল ইসলাম
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ উক্ত আলেমের বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ এখানে দু'টি বাক্য রয়েছে। ১ম বাক্য দ্বারা তাওহীদকে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং ২য় বাক্য দ্বারা রিসালাতকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা দু'টির মাঝে তুলনা করা হয়নি। বরং পৃথক পৃথক দু'টি জিনিসকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং উহা শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে যিকিরের ক্ষেত্রে শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে। কারণ যিকির শুধু আল্লাহর হয় রাসূলের হয় না। বরং রাসূলের হয় আনুগত্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৩০৬, 'যিকির' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩০৩)ঃ মায়ের গর্ভে ছেলে বা মেয়ে সন্তান হওয়ার কোন নির্দিষ্ট কারণ আছে কি?

- মুহাম্মাদ দেলোয়ার জাহান
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত *(লোকমান ৩৪)*। তবে যার বীর্য রেহমে আগে প্রবেশ করে সন্তান তারই সাদৃশ্য হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৪, 'গোসল' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩০৪)ঃ বিবাহে ঘটকালি করে মোটা অংকের টাকা নেওয়া কি জায়েয? চুক্তির মাধ্যমে ঘটকালি করা এবং জমি বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করে দেওয়ার বিনিময়ে টাকা গ্রহণ করা কি যাবে কি?

- আফতাবুদ্দীন
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ বিবাহের যোগাযোগ করে দেওয়া বা ঘটকালি করা পূণ্যের কাজ। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেও এ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল *(নাসাঈ হা/৩২৪৫)*। ঘটকালির মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক টাকা গগ্রহণ সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে যার বিবাহের যোগাযোগ করে দেওয়া হয় সে যদি খুশিমনে হাদিয়া স্বরূপ কিছু প্রদান করে, তাহ'লে তা গ্রহণ করতে পারে। অনুরূপভাবে জমি বিক্রয়ের যোগাযোগ করে দেওয়ার কারণে জমি বিক্রেতাও তাকে পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু প্রদান করলে তা গ্রহণ করতে পারে। এতে শারঈ কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩০৫)ঃ জনৈক আলেম বলেন, মালাকুল মউতের মাথায় যদি পৃথিবীর সমস্ত পানি ঢেলে দেওয়া হয়, তবুও এক ফোঁটা পানি মাটিতে পড়বে না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

- মুহাম্মাদ শাহজাহান
বাখড়া, মোলামগাড়ীহাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। মালাকুল মউত সম্পর্কে বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন বই-পুস্তকে আরো অনেক মনগড়া ও উদ্ভট কাহিনী লেখা আছে। সেগুলি থেকে সাবধান থাকা যরূরী।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩০৬)ঃ ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম কোন্ আলামতটি দেখা যাবে? উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুনীরুল ইসলাম

জাহানাবাদ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের সর্বপ্রথম নিদর্শন হচ্ছে আগুন, যে আগুন মানুষকে পূর্ব দিক হ'তে পশ্চিম দিকে একত্রিত করবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৩৭৫, 'ফিতান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩০৭)ঃ মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত এবং স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত। তাদের পায়ের নিচে কি সত্যিই বেহেশত আছে? সেই বেহেশত দু'টির নাম কি?

- শামীম সরকার
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত কথাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান সনদ জাইয়্যিদ মিশকাত হা/৪৯৩৯)*। তবে স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর জান্নাত এ মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। অবশ্য স্ত্রী যদি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করে, স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে তাহ'লে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(আবু নঈম, হিলইয়াহ, মিশকাত হা/৩২৫৪, সনদ হাসান)*। মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত এর উদ্দেশ্য হ'ল- যে ব্যক্তি পিতা-মাতার খিদমত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে হাদীছে জান্নাতের কোন নাম নির্দিষ্ট করা হয়নি।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩০৮)ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের কোন্ ওয়াক্তে কোন্ সূরা বা আয়াত পাঠ করা সুন্নাত। জুম'আর দিন ফজর থেকে নিয়ে সারাদিন নিষিদ্ধ সময়েও কি ছালাত আদায় করা যায়?

- আসাদ
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ।

উত্তরঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে যে কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করা যায়। কেননা আল্লাহ বলেন, 'কুরআনের যতটুকু সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর' *(মুয্যাম্মিল ২০)*। তবে যে ওয়াক্তে রাসূল (ছাঃ) নির্দিষ্ট সূরা পড়েছেন সেখানে অনুরূপভাবে পড়া সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) যে ওয়াক্তে যে সূরা পড়েছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

জুম'আর ছালাতে রাসূল (ছাঃ) প্রথম রাক'আতে সূরায়ে জুম'আ অথবা সূরায়ে আলা এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরায়ে মুনাফিকূন অথবা সূরায়ে গাশিয়াহ পড়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৩৯-৪০ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। জুম'আর দিন ফজরের ফরয ছালাতের ১ম রাক'আতে রাসূল (ছাঃ) সূরায়ে সাজদাহ ও ২য় রাক'আতে সূরায়ে দাহর পাঠ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩৮, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। আর ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাতের ১ম রাক'আতে সুরায়ে কাফিরূন এবং ২য় রাক'আতে সূরায়ে এখলাছ পড়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৪২, 'ক্বিরআত' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য, জুম'আর দিন মাগরিবের ফরয ছালাতে সূরা কাফিরূণ ও এখলাছ পড়া এবং এশার ছালাতে প্রথম রাক'আতে জুম'আ ও দ্বিতীয় রাক'আতে মুনাফিকূন পড়া মর্মে বর্ণিত হাদীছদ্বয় নিতান্তই যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ)*।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাগরিব ছালাতে 'ক্বিছারে মুফাছছাল' অর্থাৎ বাইয়িনাহ থেকে শেষ সূরা পর্যন্ত পড়েছেন এবং এশার ছালাতে 'ওয়াসত্বে মুফাছছাল অর্থাৎ সূরা বুরূজ থেকে বাইয়িনাহ পর্যন্ত পড়েছেন *(নাসাঈ সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/২৮৫, মিশকাত হা/৮৫৩)*। তবে তিনি কোন কোন সময় এর ব্যতিক্রমও করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/২৮৬)* জুম'আর দিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ব্যতীত দ্বিপ্রহরের নিষিদ্ধ সময়ে ছালাত আদায় করা যায় *(মুসনাদুশ শাফেঈ, মিশকাত হা/১০৪৬, 'নিষিদ্ধ সময়' অনুচ্ছেদ; মির'আতুল মাফাতীহ ৩য় খণ্ড,পৃঃ ৪৭১, 'নিষিদ্ধ সময়' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩০৯)ঃ একদা আমাদের প্রতিষ্ঠানে কিছু টাকা চুরি হয়। কেউ স্বীকার না করায় কেউ কেউ বলছেন, সবাইকে লিয়ান করানো হোক। প্রশ্ন হ'ল, চুরি করার কারণে সকলকে লিয়ান করানো যাবে কি?

- মুহাম্মাদ সুলতান মাহমূদ
নয়াপাড়া ভাওয়াল মির্জাপুর
গাযীপুর সদর, গাযীপুর।

উত্তরঃ যিনার অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে লিয়ান করাতে হয় *(নূর ৬-১০)*। কিন্তু চুরি বা কোন কিছু অস্বীকার করার ক্ষেত্রে লিয়ান করার কথা নেই। তবে এক্ষেত্রে বিচারকের নিকট বাদীকে প্রমাণ পেশ করতে বলবেন। আর বাদী যদি প্রমাণ পেশ করতে না পারে তাহ'লে বিচারক বিবাদীকে কসমের জন্য উপযুক্ত মনে করলে কসমের দায়িত্ব বিবাদীর উপর অর্পিত হবে। এরপর বিবাদী কসম করে নিজেকে মুক্ত করবে *(বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম, হা/১৪০৯, 'দাবী ও প্রমাণাদি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩১০)ঃ খালাত, মামাত, চাচাত বোনদের সাথে খোলামেলা কথা বলা যাবে কি?

- আব্দুল আলীম
শিরতা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লিখিত বোনেরা মাহরাম মহিলা নয়। সেকারণ তাদের সাথে পূর্ণ পর্দা বজায় রেখে কথা বলতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইবে, তখন পর্দার অন্তরাল হ'তে চাইবে' *(আহযাব ৫৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে নির্জনে একত্রিত হবে না। কারণ তাদের মাঝে শয়তান হচ্ছে তৃতীয় ব্যক্তি। সে তাদেরকে বিপদে ফেলে দিতে পারে *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১১৮, 'পর্দা' অনুচ্ছেদ)*।